পথের ডাকে।

মহম্মদ আবদুর রঊফ বি-এ, এল-টি।

মূল্য—১৷০ কাপড়ে বাঁধাই ১৷৷০

প্রকাশক—
মহম্মদ আবদুল অহেদ।
নারায়ণপুর, যশোহর।

১ম হইতে ৩য় ফর্ম্মা পর্য্যন্ত
নীলফামারী, মাধবী প্রেস হইতে
শ্রীহরিপদ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং ৪র্থ হইতে ১৩শ ফর্ম্মা—
বেলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৯২বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কৈফিয়ৎ

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে অন্য একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলাম। বন্ধু মহলে অনেকেই তাহা পড়িয়াছিলেন। কাহারও ভাল লাগিয়াছিল কাহারও লাগে নাই। সাধারণে প্রচার করিবার পূর্ব্বেই কোন দুর্বিপাক বশতঃ বই খানি নষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান পুস্তক খানিও সেই সময়কারই লেখা। নানারূপ অবস্থার প্রতিকূলতায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই। সময়ের স্রোতে অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হইয়া আসিলেও যে ব্যাপার লইয়া পুস্তকখানি রচিত তাহাতে হয়ত সাধারণের অনুরাগ আজিও শেষ হয় নাই। তাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। কোন মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই বই খানি লেখা নয়। আধুনিক জগতের যে সকল মূল্যবান সমস্যা মানুষের চিন্তার দ্বারে বার বার আঘাত করিয়াও সমাধান খুঁজিয়া পাইতেছে না, পুস্তকের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রের ভিতর দিয়া তাহারই একটা রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ইহাতে তাঁহাদের সামান্য একটু চিন্তার খোরাক পাইলেও নিজেকে ধন্য মনে করিব।

মৌলভী সমাজকে নিন্দা করা আজকালকার একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে মৌলভী নামধারী কোন কোন অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির বিকৃত আচরণ ও ধর্ম্মের বিকৃত রূপ প্রচারের জন্য সমগ্র মৌলভী সমাজকে নিন্দা করা যায় কিনা ও ধর্ম্মের

বিরুদ্ধে অবিশ্বাসী দলের সাধারণতঃ কি কি যুক্তি থাকিতে পারে, স্বপক্ষে বিশ্বাসীদেরই বা কি বলিবার আছে তাহা দেখাইবার জ— স্থানে স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রিয় ও অপ্রিয় আলোচনার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সমগ্র বই খানির ফলাফল দৃষ্টেই, আশা করি, সুধী সমাজ আমাকে বিচার করিবেন। ইতি—

নারায়ণপুর (যশোহর)
২২শে ভাদ্র,
সন ১৩৪০ সাল।

বিনীত—

গ্রন্থকার।



পথের ডাকে।

(১)

কলিকাতায় আসিয়া আকবর কোন প্রাইভেট ছাত্র নিবাসে বাল্যবন্ধু আমজাদ আলির আশ্রয়ে থাকিয়া চাকুরির খোঁজে ফিরিতে লাগিল। খুব উঁচু মাহিনার চাকুরিতে অর্থাৎ যে জায়গায় তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের দরখাস্ত করার সম্ভাবনা আছে, সে জায়গায় সে দরখাস্ত করে না। সে নিজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। অতএব বাজার হিসাবে সে ৫০। ৬০ টাকার বেশী কিছু আশা করিতে পারে না। কাজে ভর্ত্তি হইয়া পরে নিজের যোগ্যতার পরিচয়ে যাহা হয় হইতে পারিবে ভাবিয়া অনেক খোঁজা খুঁজির পর সুবিধামত এক জায়গায় দরখাস্ত করিয়া নিয়োগ কর্ত্তার

সহিত দেখা করিয়া কথা লইয়া আসিল যে নির্ব্বাচনের দিন তিনি তাহাকেই প্রেফারেন্স্ দিবেন। আকবর এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু নির্ব্বাচনের দিন যাইয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির। অন্যূন হাজার প্রার্থী, তাহার মধ্যে এম্, এ; এম্. এস্, সির ও অভাব নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের এই দুর্দ্দশা – বিদ্যার এই অপমান দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইল। সে ভাবিতে বসিল তাহাদের সম্বন্ধেই—যাহারা এই একটা মাত্র সামান্য চাকুরি উপলক্ষ করিয়া পঙ্গপালের মত আসিয়া জুটিয়াছে, একজন ছাড়া তাহাদের আর সকলকেই গভীর নিরাশা বুকে করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। আজিকার এই ক্ষুদ্র ভাগ্য নির্ণয়ের উপর হয়ত অনেক পরিবারের ভরণ পোষণের উপায় নির্ভর করিতেছে—হয়ত কত ক্ষুধাতুর দৈন্য পীড়িত প্রাণী ইহাদের অনেকের সিদ্ধির পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু ইহারা যখন অমন নিরাশা-মলিন মুখে তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহাদের কি হইবে? জীবনের কি নিষ্ঠুর দৈন্য! উঃ! আজিকার এই বাছাই ব্যাপারে যদি জয় তাহারই হয়, তবে সে জয়ে কি সে সুখী হইতে পারিবে? অধিক লোকের দুর্ভাগ্যের বিনিময়ে যে ব্যক্তিগত সৌভাগ্য তাহাতে আনন্দ কতটুকু? তাহার চেয়ে যে জীবন কাহাকেও আঘাত করে না, সকলকেই আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়, যাহার সৌভাগ্যে সকলের ভাগ আছে, সেই সহজ সরল পবিত্র নিরঙ্কুশ জীবন কি কোথাও নাই? আকবর আর বাছাইয়ের প্রতিক্ষা না করিয়া এক পা দুই পা করিয়া বাসার দিকে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। মন তার গুমোট মেঘের মত কান্নাভরা – গুরুবর্ষণ প্রয়াসে সমাচ্ছন্ন - কি একটা দৃঢ় সঙ্কল্প—কি একটা সত্যকার সুমঙ্গল পথ খুঁজিয়া পাইবার জন্য ভাবাকুল উদ্বিগ্ন।

কলিকাতার রাস্তার সহিত সে আজ প্রথম পরিচিত নয়, চারি-দিকের সুচারু সৌধরাজি-বেষ্টিত ট্রাম, মোটর প্রভৃতির যাতায়াত শব্দ মুখর নানা শ্রেণীর নানা অবস্থার লোক পূর্ণ রাস্তা দিয়া চলিতে অনেকবার তাহার মনে হইয়াছে যদি অমনই একটা বাড়ির অধিকারী সে হইত - যদি অমনই একখানা মোটরগাড়ী তাহার থাকিত! আজ কিন্তু সে সব কত বিশ্রী অশোভন হইয়া দেখা দিতে লাগিল। জীবন সংগ্রামে পদে পদে পরাস্ত, নিরাশা-ক্লিষ্ট দরিদ্রের দুরবস্থাকে সমবেদনাহীন নিষ্ঠুর পিশাচের মত উপহাস করিয়াই যেন সে সব দাঁড়াইয়া আছে।

বাসায় পৌছিলে বাসার অন্যান্য অধিবাসিরা তাহার দিকে কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া কহিল কৈ মিঠাই এনেছেন? চাকুরি পাইলে তাহাদিগকে মিঠাই খাওয়াবার কথা ছিল। আকবর মৌনী হইয়া রহিল দেখিয়া তাহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—চাকুরি পান নি বুঝি?

—"না"

তাহারা আর কোন কিছুর প্রতীক্ষা না করিয়া নিজ নিজ ব্যাপারে মন সংযোগ করিল। আমজাদ এতক্ষণ তাহার মুখের দিকে কৌতূহলী হইয়া চাহিয়াছিল। এইবারে কহিল - পাওনি কেন?

"পাইনি না,—আমি নিইনি"

"কেন?"

আকবর সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। আমজাদ শুনিয়া কহিল—দরবেশ সাহেব! তুমি বনে যাও!

আকবর কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া নত মস্তকে চুপ করিয়া রহিল।

আমজাদ, আকবরের বাল্যবন্ধু। দুজনের বাড়ি যদিও দুই বিভিন্ন জেলায় জেলা স্কুলে একসঙ্গে পড়িবার কালে দু'জনের ভিতর বেশ একটা অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের ভাব জন্মিয়া যায়; আজও সেটা অটুট আছে। স্কুলের পড়ায় আকবর অপেক্ষা আমজাদ অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। নিয়মিত পাঠ্য বিষয়ে সে খুব একাগ্রচিত্ত, শান্ত শিষ্ট ভাল ছেলে। আকবর কিন্তু তাহার বিপরীত। সংসারের সকল বিষয়েই তাহার কেমন একটা আড়াআড়ি ভাব. সাধারণ পাঠ্য বিষয়ে সে খুব উদাসীন আর বড় সমালোচনা প্রিয়। এজন্য অনেকবার অনেকের কাছেই তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, তবু তাহার সংশোধন হয় নাই। অনেকবার অনেকের সমালোচনার ঘায়ে বিদ্ধ হইয়া সে পণ করিয়াছে—এবার ঠিক ভাল মানুষটী হইয়া চলিবে কিন্তু সময়ে প্রতিজ্ঞার কথা তাহার মনে থাকিত না। নিজের স্বভাবের এই দুর্ব্বলতা সে মানিত, আর সেজন্য লোকের সহস্র অপবাদ সে নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইত, কিন্তু তাহার একটা টান ছিল যা অসাধারণ, যা অসামান্য তাহার পরেই; সংসারের কাছে সে টানের কোন মূল্য নাই। তাই সে নিজেও তাহাতে তাহার কোন মূল্য উপলব্ধি করে নাই। যাহা হউক দুই বন্ধুতে একসঙ্গে পাশ করিল। আকবর যদিও ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করিল, আমজাদ কিন্তু স্কলারশিপ পাইল। পরে দুই বন্ধুতে কলিকাতার একই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বেকারের দুই পাশাপাশি কামরায় বাস করিতে লাগিল। মফঃস্বলে অভিভাবকের আশ্রয় হইতে কলিকাতায় আসিয়া একটু স্বাধীনতা পাইয়া আকবর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কলেজের বইগুলো আদ্যোপান্ত

পড়িয়া লইয়া তাহাতে তেমন কিছু নূতনত্ব পাইল না। মন তখন তাহার অন্য অনুসন্ধানে ছুটিল। কলিকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে হকারেরা অনেক সাময়িক পত্রিকাদি বিক্রয় করে; তাহার কতকগুলি কিনিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল—সে সব লেখার সঙ্গে তাহার মনের ভাবের যথেষ্ট মিল আছে। তাহার লোভ বাড়িয়া গেল। কলেজ লাইব্রেরী হইতে যুগ-পরিবর্ত্তনকারী নামজাদা লেখকের কতকগুলি বই আনিয়া পড়িয়া দেখিল—সে যে কথা ভাবে অনেক বড় বড় লোকই সে কথা ভাবিয়াছেন ও সে সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন। তাহাদের জীবনী পড়িয়া দেখিল—তাহারাও তাহারই মত প্রথম বয়সে লোক সমাজে তেমন আদৃত ও সম্মানিত হন নি। নিজের স্বভাবের অনুকূলে এই পথ পাইয়া তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। যে কথা সে অনেকবার ভাবিয়াছে, অথচ প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই আজ নিঃসঙ্কোচে বন্ধু মহলে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধুরা চটিয়া উঠিল; আঘাত পাইয়া তাহার বুকের শক্তিও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। তর্কে তাহার সঙ্গে কেউ পারিয়া উঠিত না। ফলে পরাজয়ের ব্যথায় অনেকেই তাহার উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িল। আমজাদ কিন্তু এই তর্ক ব্যাপারে আদৌ যোগ দিতে চাহিত না, কিন্তু তর্কটা যখন পাকিয়া উঠিয়া ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম করিত, তখন প্রতিপক্ষের মুখের ঝগড়া কাড়িয়া লইয়া নিজেই আকবরের সঙ্গে লাগিয়া যাইত। ফলে তাহাকেও আকবরের সুনিপুণ সুসম্বদ্ধ তর্কবাণে বিদ্ধ হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতে হইত। তাহা হইলেও আমজাদ চটিত না। এই না চটাটাই আমজাদ চরিত্রের একটা মস্ত বড় বিশেষত্ব। অধিকন্তু একটা মস্ত বড় গুণ আমজাদ আকবরের চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার স্বভাবের

অকৃত্রিম সরলতা, যাহা অনেক আদর্শ স্থানীয় লোকের চরিত্রেও নিতান্ত অভাব দেখিয়া আমজাদ অনেক সময় মর্ম্মাহত হইয়াছে। লোকের সঙ্গে অনর্থক চটাচটী না করিয়া নিজের মত চাপা দিয়া রাখিতে উপদেশ দিতে আকবর নিজেও অনেক সময় বলিয়াছে— আমি যা তাই, অন্য কিছু হবার ভাণ করব না। কেন বাবা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস যদি তোমাদের এত ঠুন্‌কো হয়, যে তার বিরুদ্ধ মতের সংস্পর্শে এসে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সে ভূয়ো তালি দেওয়া বিশ্বাস পুষে রেখে লাভ কি? যে সত্যকে মিথ্যার ভয়ে চুপি চুপি পা ফেলে চল্‌তে হয় সে সত্যের মূল্য কতখানি? আলো যা তা কি আঁধারের ভয় করে চলে?



(৩)

বি, এ, পাশ করিয়া আমজাদ এম, এ, পড়িতে ও বি, সি, এস এর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আকবর বি, এ, পরীক্ষা না দিয়া নন-কো-অপারেশন করিয়া পল্লী-সংগঠন ও চরকা প্রচলন চেষ্টায় গ্রামে গেল। বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিয়া সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া গ্রামবাসিদিগকে চরকা মাহাত্ম্যে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইল, শেষে বিফল মনোরথ হইয়া বুঝিল—যাহা মরা তাহা কোন প্রকারেই বাঁচানো সম্ভব নয়; তবু যে মানুষ চেষ্টা পায় সে কেবল মূর্খতা। চরকা সেকেলে, এই ম্যানচেষ্টারি যুগে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা। চরকা ফ্যাসন হিসাবে ভদ্র পরিবারেরা গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু জীবিকা অর্জনের সহায়তা রূপে দরিদ্র কৃষি পরিবারের পক্ষে যাহার সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও অন্ন সংস্থান হয় না যে চরকা ঘণ্টায় মাত্র আধ পয়সা উপার্জ্জন দেয় তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব। ম্যানচেষ্টারকে অচল করার চেষ্টার মূলে যে দেশহিত ব্রত ও স্বাধীনতার স্পৃহা রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞ নিরক্ষর চাষা বুঝে না। দেশের মুক্তি তবে কোন পথে? মুক্তির মহিমা প্রচার করিতে গিয়া বুঝিল, দেশ বলিতে যে হাজার করা ৯৯৯ জন বুঝায় মুক্তির মূল্য তাহাদের নিকট নিতান্তই তুচ্ছ। দুর্ভিক্ষের সময় পিতা মাতা যেমন সন্তানের প্রতি মমতা শূন্য হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া পলায়, নিদারুণ দারিদ্রের পেষণে ও নানাবিধ কুসংস্কারেও তেমনি দেশের লোক নিজের ক্ষুদ্র

স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না, বুঝিবার অবকাশও পায় না। এই দারিদ্রের কারণ শুধু বিদেশী শোষণ নীতি নয়; অনেক কুসংস্কার, অনেক কুপ্রথা ও বদ্‌খেয়াল এই নিষ্ঠুর অভাব ও দারিদ্রকে নিত্য ডাকিয়া আনিতেছে। এ সবারই প্রতিকার একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষার অভাবই যত অনিষ্টের মূল। শিক্ষার অভাবই অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে পালন করিতেছে, শিক্ষার অভাবই মানুষের অনেক ছোট ও হাল্‌কা রুচির প্রশ্রয় দিতেছে, শিক্ষার অভাবই মানুষের সত্যিকার মুক্তির পথ, বড় হওয়ার—মানুষ হওয়ার পথ অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। মুক্তির কথা বলিলে মানুষ বুঝে ও মানে কিন্তু প্রেরণা পায় না, নেশায় পাগল হয় না কেবল এই জন্যেই। তাই সর্ব্বপ্রথম চাই শিক্ষা, শিক্ষা পাইলেই মানুষ আপনার বৃহত্তম সামাজিক ও সার্ব্বজনীন সত্বাটাকে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পারিবে আর তখনই সেই বৃহত্তম সত্বার মুক্তির জন্য পাগল হইবে। মুক্তি তখন আসিবে আপনিই। কিন্তু এই শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়? রাজার কাছে হাত পাতিয়া কিছু হইবে না; চাঁদা আদায় করিয়াও সম্ভব নয়। চাঁদা কে দিবে? ক'দিন দিবে? গভর্ণমেণ্টকে যদি লোকের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয় তবে সে গভর্ণমেণ্ট একদিনও টিকে না। চাই আইন, চাই একটা বাধা বাধকতা, চাই একটা শাসক শক্তি বা authority যে নাকি ব্যক্তির নিকট হইতে সমাজের জন্য তাহার এই কর্ত্তব্য আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু সেটা কি সম্ভব বা সঙ্গত? অতিরিক্ত ট্যাক্সের ভারে দেশের লোক একেই পীড়িত, তাহার উপর নূতন ট্যাক্স মরার উপর খাড়ার ঘা হইবে নাকি? তবে? আকবরের চোখে পড়িল কতকগুলো

সামাজিক অপব্যয়ী কুপ্রথা। খানা করা—নিছক অপব্যয় ও অর্থনাশ—কাহারও কোন লাভ হয় না—একবেলার খোরাকও হয়ত কাহারও বাঁচে না অথচ যে করে, সে করে হয় তাহার সঞ্চিত টাকাগুলো শেষ করিয়া দিয়া অথবা কর্জ্জ করিয়া; নাম ও যশ লক্ষ্য হইলেও নাম ও যশ লাভ হয় না; নিছক লৌকিকতা—একটা মিথ্যা অনিষ্টকর কুপ্রথা। আকবর দেখিল—এই প্রথাটাকে মারিয়া বা ছোট করিয়া শিক্ষা ফণ্ডে অনেক কিছু পাওয়া যাইতে পারে। আকবর গ্রামবাসিদের একটা সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতায় শিক্ষার উপকারিতা ও খানা করার অযৌক্তিকতা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিল। বিবাহ উপলক্ষে বা মৃতের সৎকারে যাহাতে সম্ভবমত ব্যয়টা শিক্ষা ফণ্ডে যথোচিত ও নিয়মিত আদায় হয় সে জন্য গ্রামবাসিদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটী সমিতি গঠন করিতে চাহিল। সেই সমিতির দ্বারা ঝগড়া, বিবাদ বিসংবাদেরও মীমাংসা হইতে পারিবে। এই প্রস্তাবে দুই একজন ছাড়া গ্রামবাসিদের অপর কাহারও কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হইল না। তাহার বক্তৃতা এযাবৎ সকলেই খুব উৎসাহের সহিত শুনিয়াছে; তাহাতে তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল এ কাজ হয়ত সে পারিবে! কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সকলের উদাসীনতা দেখিয়া সে মর্ম্মাহত হইল। গ্রামবাসিদের প্রতি তাহার একটু রাগও হইল। সে হাল ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিন লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল। সহসা একদিন সে ভাবিতে চেষ্টা করিল—আচ্ছা খানা করে কেন? খানাতে কি শুধু খাওয়াই হয় আর কিছু নয়? খানার মূলে কি লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নাই? আকবরের হঠাৎ মনে পড়িল—হাঁ একটু আমোদও আছে

বটে ; আমোদ-- জীবনের যা নাকি একটা মস্ত বড় ন্যায্য পাওয়ানা। যে জিনিষটা কৃষকের জীবনে একান্তই অভাব ; থানার উৎসবে সে অভাবটার কথঞ্চিৎ পূরণ হয় বটে, কিন্তু বড় মারাত্মক উপায়ে— মনুষ্যত্বের দিকটা চাপা দিয়া পশুত্বের দিক দিয়া। প্রতিবেশী হিন্দুর জীবন হাতড়াইয়া দেখিল, সেখানে তাহারা আমোদ উৎসবের সঙ্গে একদম নন্-কো-অপারেশন করিয়া বসিয়া নাই। তাহাদের ভিতর সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতির চর্চ্চা আছে। বার মাসে তের পার্ব্বন উপলক্ষে উৎসব আনন্দেরও অবকাশ আছে কিন্তু মুস্‌লিম কৃষি-জীবন একদম শুষ্ক নিরানন্দ, কিন্তু কেন ? ভাবিতেই ধর্ম্মের উৎকট অনুশাসন, খোদার রক্তচক্ষু ও দোজখের মহা বিভীষিকা তাহার চোখে পড়িল। মুহূর্ত্তে নিরীহ কৃষকের প্রতি মমতায় সমবেদনায় তাহার সারা অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। হায় হতভাগারা! কোন কুক্ষণেই তোরা এই কলেমারূপ মহা ফাঁদে পড়িয়াছিলি আর সেই অবধি পৃথিবীর সকল সুখ সম্ভোগ, আশা আনন্দ ও হাসি খুসিতে তোরা বঞ্চিত। পৃথিবীর সুখ ঐশ্বর্য্য আমোদ আহ্লাদ তোদের জন্য নয়—তোদের জন্য পরকালের মেওয়া ও হুর পরী, সেই মরার পর কবরের ভিতর মন্‌কির নকিরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে। আর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে শিশুকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দিন রাত বসিয়া শুষ্ক কেতাবী কলেমা ও নবীর তারিফ করিয়া যাইতে হইবে। এক মুহূর্ত্তও এদিক ওদিক চাহিতে পারিবে না। আকাশের চাঁদ, ফুলের সুষমা, বিহগের গান, নদীর কুলু কুলু ধ্বনী তোমায় যতই প্রলোভন দেখাইয়া হাসিতে ও গাহিতে বলুক, তুমি হাসিও না গাহিও না। উহারা সয়তান! উহাদের দিকে কাণ দেওয়াও পৌত্তলিকতা—গম্ভীর হইয়া

ফিরিয়া থাক আর পড়— লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মদর রসুলুল্লা! আর বল—আহা! মহম্মদ কি ভাল পয়গম্বর! আমাদের চার বিবি দিয়াছেন, পেট ভরিয়া গোস্ত খাইতে বলিয়াছেন, হাসরের দিন আমাদের জন্য কাঁদিবেন ও মেওয়া পাড়িয়া দিবেন। কি নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা, উঃ! কিন্তু এজন্য দায়ী কে? যথার্থ ধর্ম্ম না ধর্ম্মের যাহারা প্রচারক বা ব্যাখ্যা কর্ত্তা। তাহার ইচ্ছা হইল—ধর্ম্মটা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখ; কিন্তু দুনিয়া সুদ্ধ ত ঐ একই ব্যাপার! শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির চর্চ্চা এখানেও যে চক্ষে দেখা হয় সর্ব্বত্রই সেই একই চক্ষে দেখা হয়। ধর্ম্মে যদি এ সব নিন্দে করা না হইয়া থাকে ধর্ম্ম প্রচারকেরা এ সম্বন্ধে একমত হইলেন কি করিয়া? পৃথিবীর সকলের দ্বারা একই ভুল হওয়া কি সম্ভব? নিশ্চয়, ধর্ম্মই এ জন্য দায়ী; আর এই ধর্ম্মকে যতদিন সমূলে উৎপাটিত করা না যাইতেছে ততদিন মানুষের এ দুর্গতির কিছুতেই অবসান নাই।

ধর্ম্ম মানুষকে মারিয়াছে শুধু আনন্দের দিক দিয়া নয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সকল দিক দিয়াই। চরিত্র সংশোধনের দিকে মানুষের খেয়াল নাই, কেননা মানুষ জানে যে যত বড়ই পাষণ্ড ও পাপাচারী হউক না কেন, দু রেকাৎ নামাজ পড়িলেই ত তার সাত খুন মাপ—খোদা ত তাহার কলেমারই ভিতর, তস্‌বির ডগায়। জ্ঞান চর্চ্চায় মানুষ উদাসীন—কেননা বেহেস্তই যখন জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম ভোগ্য আর সে বেহেস্ত পাওয়া যায় জ্ঞান চর্চ্চায় নয়—কলেমার ভিতর দিয়া, তখন কেন সে ঐ দীর্ঘকাল সাধনা সাপেক্ষ ব্যয় বহুল বিদ্যা চর্চ্চায় সময় অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট করিবে? আকবর বুঝিল—এই ধর্ম্মই যত অনিষ্টের মূল ও সয়তানের বাসা - ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই বাস! আপনিই সব ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু ভাঙ্গা ত

সোজা ব্যাপার নয়! দীর্ঘ দু হাজার বৎসর ধরিয়া যাহা সমাজ দেহে শীকড় গাড়িয়াছে, জীবনের আষ্টে পিষ্টে জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহা একদিনে তাড়ানোর আশা বৃথা। তবে? না, ব্যাপার যতই দুরুহ, জটিল ও কষ্টসাধ্য হউক না কেন ভয় পাইলে চলিবে না। যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে—যে কোন প্রকারে। বিপদ, বাধা, ভয় আশঙ্কা কোন কিছুই পরোয়া করিলে চলিবে না। ধীরের মত আদর্শের উচ্চ শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। সঙ্গী না জোটে নাই জুটুক; একা! তবু সে সত্যেরই উপাসক। নিঃসম্বল! তবু সে বিশ্বেরই কাজে লিপ্ত ও নিবেদিত প্রাণ।

কি একটা আক্রোশে-কিসের একটা উত্তেজনায় আকবরের বক্ষ মণ্ডল স্ফীত হইয়া উঠিল। সে বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল—কিসের একটা দুর্দ্দমনীয় বেগ—কিসের একটা চাঞ্চল্য—কি যেন একটা ঠেলিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা।

সঙ্কল্পের কথা সে কাহাকেও বলিল না। কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিয়া কলিকাতায় যাইতে প্রস্তুত হইল। মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- কোথায় যাবি?

"যাব কলকাতায়"

—"কেন?"

একটা কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখিগে, কিছু টাকা দেবে মা?

- টাকা? টাকা যা ছিল তা ক'দফা তুইত নিয়ে গেলি! টাকা আর কোথায় পাব? তোর বা'জানকে বলে কিছু নিয়ে যা না!

বাপের কাছে টাকা চাহিতে আকবরের আর সাহসে কুলায় না। সে যে পড়া ছাড়িয়া বাড়ি আসিয়াছে, বাপ তাহাতে তাহার উপর

একটুও সন্তুষ্ট নন, তাহা সে ইদানীং বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। সে যদি পুনরায় পড়িতে চায় তবে হয়ত বাপ খরচ দিতে পারেন কিন্তু দেশের জন্য কোন কাজে টাকা দিবেন তাহাতে তাহার বিশ্বাস হয় না। চাহিলে হয়ত বিরক্তও হইতে পারেন। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল—রেল ভাড়াটাও দিতে পারবে না, মা?

—আচ্ছা দেখি আছে কিনা।

বাক্সের ভিতর খুঁজিয়া পাঁচটা টাকা মিলিল। মা তাহাই তাহার হাতে দিয়া কহিলেন—এই নে, ভাল ক'রে মন দিয়ে একটা কাজের চেষ্টা দেখ্‌গে। দু' পয়সা উপায় করতে পারলে সবাই ভাল বল্‌বে; লোকেও কথা শুন্‌বে। এখন জানিস কি, অনেকে অনেক কিছু মনে করে। আজ কাল্‌কের দুনিয়ায় কি কেউ কা'কেও বিশ্বাস করে? আমরা এদিকে একটা ভাল পাত্রীর সন্ধান দেখি। "আজ কালকের দুনিয়ায় কেউ কা'কেও বিশ্বাস করে না" কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়। টাকা পাঁচটা পকেটে লইয়া মা'কে একটা সেলাম দিয়া ভাবিত চিত্তে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। মা' তার পিছন পিছন গেট পর্য্যন্ত গিয়া আকবরকে দেখিতে দেখিতে যখন সে অদৃ গেল তখন ফিরিয়া আসিলেন।



কলিকাতায় আসিলে আমজাদ আকবরকে দেখিয়াই ঠাট্টার সুরে বলিয়া উঠিল—কিহে দেশ উদ্ধার হ'ল ?

—দেশ উদ্ধার ত আর একজামিনে পাশ করা নয়, শুধু দু'টো মুখস্থ বুলি লিখে দিয়ে আস্‌লেই হয়ে গেল। অনেক কাঠ খড়ির দরকার। অনেক সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার, বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারাই দেশ উদ্ধার সম্ভব। আর দেশ ত শুধু আমার নয়। দেশ কোটী কোটী লোকের, দেশ তোমারও ; কিন্তু তোমাদের মত স্বার্থপর আত্ম-সর্ব্বস্ব লোক নিয়ে দেশ উদ্ধার হয় না। দেশ উদ্ধারের জন্য চাই ত্যাগ স্বীকার, আত্মোৎসর্গ ও সাধনা—চাই একাগ্র একনিষ্ঠ দৃঢ় পণ—তোমার, আমার, সকলের।

—কিন্তু তুমি ত একাই পারবে মনে করে গিয়েছিলে !

—আমি একাই পারব মনে করে যাইনি, সকলের দ্বারা পারব মনে করে গিয়েছিলাম ; কিন্তু যতদিন তসবি আছে, বেহেস্ত, কোরাণ, খোদা ও নবী আছে ততদিন সে "সকলের" অন্ততঃ দেশের জন্য কোন মানে নেই। নবী ও কলেমা রূপ যে জগদ্দল পাথর তাদের বুকের উপর চাপান আছে আগে সেইটাই সরাবার দরকার, তার পর অন্য কথা।

—নবী ও কলেমা কি চরকা চালাতে বারণ করে ?

—তুমি ভুল বুঝছ, চরকাই দেশ উদ্ধার করবে এ ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না, আজও নেই ; আমার বিশ্বাস সে ধারণা

গান্ধিজীরও নেই ; তবে চরকাকে আমরা নিয়েছি দেশ সেবার প্রতীক-রূপে, স্বাধীনতার আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার কেন্দ্রশক্তি হিসাবে। সত্যিকার স্বরাজ আসবে—চরকায় নয়—মানুষের একাগ্র সাধনায়, সমবেত চেষ্টায়। কিন্তু সে একাগ্র সাধনা ও সমবেত চেষ্টার পথে বাধা একমাত্র শাস্ত্র—যে শাস্ত্র মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করে রাখে—যে শাস্ত্র সকলকে ত্যাগ করে নিজের মুক্তি, তা সে যে উপায়েই হ'ক, খুঁজ্‌তে শিক্ষা ও উপদেশ দেয়—যে শাস্ত্র বেহেস্তের প্রলোভন ও দোজখের ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভীরু, দুর্ব্বল, আরাম লোভী, স্বার্থপর পশু করে তোলে, মানুষের মানুষ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে, পশুত্বের প্রলোভন ও ভয় দ্বারা মনুষ্যত্বের প্রেরণাকে নির্ম্মম ভাবে চেপে রাখে। অধীনতার বেদনা তাই আজ মানুষের কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেনি ; বিদেশী শোষণ-শক্তির কাছে আত্ম বিক্রয় করে সর্ব্বস্ব খুইয়ে বসে আছে, কেননা মনুষ্যত্ব তার অপহৃত, প্রাণ শক্তি তার নিস্তেজ নিষ্পিষ্ট, দৃষ্টি তার সঙ্কীর্ণ, দুর্ব্বল, খাটো। সে সকলের সঙ্গে এক করে নিজেকে দেখে না, সকলের থেকে পৃথক করে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে কলেমার ভিতর দিয়ে খোদার উদ্দেশ্যে নবী সম্বন্ধে শুধু ভুটো তোষামোদী বুলি কপ্‌চে। আগে ভাঙ্গ্‌তে হবে এই বাঁধন—সরাতে হবে এই জঞ্জাল—তার পর মুক্তির কথা—স্বাধীনতার কথা—দেশ উদ্ধারের কথা।

কথাগুলি আমজাদের মনে বিশেষ কোন পীড়া দিল না আবার অনুমোদনও পাইল না। সে যদিও নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, ধর্ম্মের প্রধান প্রধান বিধানগুলো যথাযথ পালন করে, বেহেস্তের লোভে বা দোজখের ভয়ে নয়, তাহার একটা প্রত্যক্ষ ও আশু নৈতিক সার্থকতা আছে বলিয়াই সে তাহা করে। সে মহম্মদ (দঃ) কে

মানে একজন যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ রূপে, খোদার বরপুত্র বা অন্য কিছু রূপে নয়। মহম্মদের (দঃ) ধর্ম্মকে সে মানে, তাহার একটা বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা আছে বলিয়াই, অতিমানুষী মহাতত্ত্বরূপে নয়। দেশ ভক্তি ও দুঃখী দরিদ্রের প্রতি করুণা তাহারও ভিতর আছে কিন্তু বড় নীরব! বড় গভীর! দেশ সেবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার ভিতর আছে কিন্তু বড় দূর লক্ষ্যের। আত্মোৎসর্গের খুব দাম সে মানে কিন্তু পর নির্ভরশীল কপর্দ্দকহীন দীন ফকিরের আত্মোৎসর্গের কোন দাম আছে সে মানে না। যে জিনিষ যত মূল্যবান তাহার উৎসর্গের গরিমাও ততই মহান। যাহা উৎসর্গ করিতে হইবে তাহা তেমনি হওয়ার দরকার যাহাতে উৎসর্গ সার্থক হয়; তাই সে আত্মোন্নতি সাধনে তৎপর। আগে পৃথিবীতে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার মত একটা জায়গা করিয়া লইয়াই সে লড়িবে দুঃখ, দারিদ্র, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে; ধর্ম্মেরও সে সংস্কার চায়, তবে মূলোৎপাটন নয়। জীবনের ধারা ও পদ্ধতি এইরূপে দুই জনের বিভিন্ন প্রকারের হইলেও আমজাদ আকবরের হিতৈষী-চেষ্টাকে অন্তরে অন্তরে প্রশংসা করিত। আকবরের যে কাজকে সে ভুল বুঝিত যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইত, না বুঝিলে তাহার উপর কোন দিন বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইত না। অধিকন্তু আমজাদ আকবরের সংস্পর্শে একটু আমোদ বোধও করিত; কেন সে জানে না। বোধ হয় তাহার সতেজ শক্তিমান ভাবুক মনের স্নিগ্ধ সজীবতায়, বোধ হয় তাহার সরলতা ও অকপটতায়—বোধ হয় তাহার স্বভাবের অনুপম অম্লান মাধুর্য্যে। আকবরের ভিতর একটা বিরাট মৌলিক শক্তির সন্ধান সে অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছে; তাই

সে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার নিজেরই হাতে—বন্ধু বলিয়া আত্মীয় বলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই।

আমজাদ ধীরভাবে কহিল—দেখ আকবর, আসল ধর্ম্মটা কি সেটা আগে না বুঝে না জেনে ধর্ম্মের মাত্র একটা সামাজিক মূর্ত্তি দেখেই ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত হওয়া কি তোমার উচিত?

-- ধর্ম্মের সামাজিক মূর্ত্তি আর ধর্ম্মের আসল মূর্ত্তি যে দুই তা ত আমার মনে হয় না!

—তোমার মনে হয় না বলেই যে তা নয় একথা কি ক'রে বল্‌তে পার—তোমার মনটাই যে ঠিক তার প্রমান? এক একটা জিনিসের উপর এক একটা লোকের একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ থাকে, তোমার যে তা নেই তার প্রমাণ?

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ধর্ম্মকে সমাজ ভুল ক'রে নিয়েছে, কিন্তু তাই কি ঠিক? পৃথিবী শুদ্ধ সকলে একই ভুল করলে এটা কি সম্ভব? ধর্ম্মের উপর আমার প্রধান ও প্রথম অভিযোগ যে সে কাল্‌চারের বিরোধী। তাই নয় কি? পৃথিবীতে কোন মোসলেম সমাজে কাল্‌চার বলে যদি কোন জিনিষ থাক্‌ত তা হ'লে কি তাদের এমন ক'রে প্রতিবেশী খৃষ্টান শক্তির কাছে পদে পদে ঠোকর খেতে হ'ত? তুমি হয়ত কেতাবের কোন অন্ধকার কোণ থেকে একটুখানি একটা শ্লোক দেখিয়ে বলবে—জ্ঞান অন্বেষণ কর যদিও তা চীন দেশে হয়; কিন্তু সে শ্লোক অনুসারে লোক চলে না কেন তা ভেবে দেখেছ কি? আমার মনে হয় চলে না এই জন্য যে ঐ কেতাবের ভিতরই আবার হাজার জায়গায় এরই বিরুদ্ধ কথা বলা হয়েছে—কোরান, খোদা, রসুল, দোজখ, বেহেস্ত না মানলে সে মুসলমান নয়। যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস কি সকল জ্ঞান চর্চ্চার বিরোধী

নয়? জ্ঞান অন্বেষনে ব্রতী মন কোন জায়গায় যদি কোরাণকে না মানতে পারে তখনই তুমি বলবে—তোমার মনই খারাপ; কিন্তু খারাপ হ'লেও জ্ঞান চর্চ্চা যে করবে সে ত মন ছাড়া আর কেউ নয়! মনকে বাদ দিয়ে বা অস্বীকার করে কি জ্ঞান চর্চ্চা সম্ভব? মন কোরানের গণ্ডি ডিঙ্গুতে পারবে না বল্লেই মনকে অস্বীকার করা হয়, আর মনকে অস্বীকার করেই মুসলমান সমাজ গোল্লায় গেছে।

—কিন্তু মুসলমান সমাজে কি জ্ঞান চর্চ্চা ছিল না এক সময়? তারাই না ছিল—the torch bearer of civilization & culture to the whole world?

—ছিল তা মানি। এখন আর নেই কেন তা শুনি?

—কোটী-পতির ছেলেও অনেক সময় পথের ভিখারী হয় কেন তা শুনি?

—কোটীপতির ছেলে পথের ভিখারী হয়েও যদি তার মরা বাপের কবরের গোড়ায় একটু জল ছিটিয়ে, দুবেলা একটু তস্‌বি পড়ে দিয়ে মনে করে যে তার মরা বাপই আবার তাকে কোটীপতি করে দেবে তখন তাকে কি বল্‌বে? বলটাকে ছুঁড়ে দিয়ে ছোড়ার মালিক অন্তর্ধান করেছেন, অনেক কাল হ'ল বল থেমে গেছে; এখনও যদি সে আত্ম চেষ্টায় ভর না করে মালিকের আশায় বসে থাকে তখন তাকে কি বল্‌বে?

—অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও সমাজ নিজেই চল্‌তে পারে, তার কোন কর্ণধারের দরকার হয় না।

—একদম না, আর হলেও চিরস্থায়ী অবিসংবাদ্য কর্ণধার মেলে কই। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ বা ৬ লাখ ৩৬ কোটি পয়গম্বরের কেউ কি চিরস্থায়ী অবিসংবাদ্য কর্ণধার হ'তে পেরেছেন? সবারই সঙ্গে সবারই অল্প বিস্তর এক আধটুকু ঠোকাঠুকি আছে, তা ছাড়া তারা কোথায় এখন?

– তারা নেই, তাদের শিক্ষা আছে, শ্রেষ্ঠতার শেষ প্রমাণ হয় নি কিন্তু সময় আছে।

—শিক্ষা আছে কিন্তু সে সমাজ নেই, সময় আছে কিন্তু তার জন্য অনেক কাজও আছে।

—তুমি কি মনে কর কর্ণধার না হইলে সমাজের চলে ?

— খুব চলে, ভালই চলে।

—কিন্তু সমাজ ত unit (একক) নয় এ যে composite (সমষ্টি)। এর প্রত্যেক unit কে যদি সমান অধিকার দেওয়া যায় বিশৃঙ্খলতা আসবে না ?

—বিশৃঙ্খলতা আসে, শৃঙ্খলার উপায় করে নিতে হবে, রাজনৈতিক সমান অধিকারে বিশৃঙ্খলতা আসে নি ?

—রাজা রয়েছে যে !

—কিন্তু রাশিয়ায় ?

—রাশিয়ায় গভর্ণমেণ্ট নেই ?

—কিন্তু সে ত রাজার গভর্ণমেণ্ট না ! সকলের দ্বারা সকলের গভর্ণমেণ্ট।

—রাশিয়ায় গণতন্ত্রবাদ সার্থক হয় কিনা তারও ত সন্দেহ আছে !

—কিন্তু তারা যে autocracy বা রাজতন্ত্রে ফিরে যাবে তারও ত কোন সম্ভাবনা নেই, রাশিয়ায় গণতন্ত্র যদি ব্যর্থ হয় তবে হয়ত তারা এমন এক রাজতন্ত্র নেবে যা নাকি tried by the time (বর্ত্তমানের দ্বারা পরীক্ষিত) যেমন ইটালী নিয়েছে তার মুসোলীনিকে। মোটের উপর কথা এই অতীত যুগের কোন বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদের দ্বারা বর্ত্তমান যুগের কোন সমাজের কোন বিষয়ের নেতাগীরি চল্‌বে না।

বর্ত্তমান সমাজ দরকার মত সময়ে ক'কে নেবে, সময়ে খ'কে নেবে কিন্তু কাকেও চিরস্থায়ী ভাবে নেবে না।

—বর্ত্তমান যুগে কাকে তুমি ধর্ম্মনেতা মনোনীত করছ?

—কাউকে না, প্রথমে সমাজকে গণতন্ত্রের trial (পরীক্ষা) দিতে হবে, তার পরে যা হয় হবে।

—কিন্তু বর্ত্তমানের রাজতন্ত্রকে সরাবে কি করে?

—Propaganda (প্রচার) দ্বারা।

—Propaganda কি প্রচারকের সাহায্যে অথবা খবরের কাগজের সাহায্যে?

—উপযুক্ত সংখ্যক প্রচারক এখন পাচ্ছি কোথায়? তাছাড়া প্রচারকের সাহায্যে সুবিধা হবে না—বিপজ্জনকও বটে। কাগজের সাহায্যেই করতে হবে প্রথমে লোক খেপবে, পরে আস্তে আস্তে নেবে।

—কোন কাগজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছ, না নিজেই বের করবে?

—নিজেই বের করব।

—সম্বল?

—ধার ক'রে!

—কে দেবে?

—তাইত ভাবছি!

কিছুদিন বন্ধুমহলে ঘুরিয়াও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। আনজাদ বুঝাইল—দেখ, ও সব বাজে খেয়াল ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজ দেখ। সৃষ্টিকে যদি ভাল ক'রে নেওয়ার দরকার হয় যার সৃষ্টি তিনিই তা করবেন—তোমার আমার বেশী মাথা ব্যথা না করলেও চলতে পারে।

—স্রষ্টা নিজে কিছু এসে সব করেন না। তিনি যা করেন তোমার আমার ভিতর দিয়েই করেন। আমজাদের তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না, তাই সে প্রথমেই হার মানিয়া নিয়া কহিল—আচ্ছা তবে দেখ, কি করতে পার।

(৫)

আকবর আরও কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ক'রে এলি ?

—কিছুই না।

—তবে ?

—কিছু টাকা না পেলে কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে। বাপজানকে বলে কিছু টাকা দাও, আমি একটা খবরের কাগজ বের করব।

মা বুঝিলেন—ছেলের মাথায় আবার একটা খেয়াল ঢুকিয়াছে, নিরস্ত করিবার জন্য কহিলেন—খবরের কাগজ তুই চালাতে পারবি

কেন ; গভর্ণমেণ্টের লোক ভিন্ন কি কেউ খবরের কাগজ চালাতে পারে ?

—না মা, যারা কাগজ চালায় তারা কেউ গভর্ণমেণ্টের লোক না, তারা এই দেশী লোক।

—তা তুই আজও তেমন হ'তে পারিস নি ; তার চেয়ে তুই একটা চাকুরি বাকুরি করগে।

—চাকুরি আমায় কে দেবে মা ? আমি যে নন-কো-অপারেটর ! স্বাধীন কাজ করতে হলেই টাকার দরকার।

মা ছেলের ভবিষ্যত ভাবিয়া হতাশ হইলেন। আকবরের পিতা কাজী সাহেব বাড়ী আসিলে মা আকবরের মতলবের কথা পাড়িলেন। কাজী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া কহিলেন—ওকে কিছুদিন বাড়ী থাক্‌তে বল। আমি একটা বিয়ে দিয়ে দিই ; বিয়ের পর যা হয় করবে।

বাপের বিশ্বাস বিবাহ হইয়া গেলে ছেলের মস্তিষ্ক বিকৃতি সারিয়া যাইবে। প্রকৃতিস্থ হইয়া সংসারের কাজে মন দিবে। মা বিবাহের কথা পাড়িলেন—

আকবর কহিল—বিয়ের জন্য ত আমি প্রস্তুত নই মা ! তা ছাড়া বিয়ে আমি করব না, আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

—ও সব বাজে খেয়াল ছেড়ে দিয়ে সংসারের কাজে মন দে।

—না মা, খেয়াল আমি ছাড়্‌তে পারব না। আমি একবার শেষ দেখব।

—বিয়েটা করেই কাজ করবি !

—সে হয় না, বিয়ে করলে আমার সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

—বিয়ে না করলে তুই যে টাকা চাচ্ছিস পাবে কোথায় ? তোর

শ্বশুর যিনি হচ্ছেন তিনি খুব ধনী লোক— সাহায্য করতে পারবেন; সাহায্যের কথা শুনিয়া আকবর উৎফুল্ল হইয়া কহিল- সাহায্য করতে চেয়েছেন ?

— একমাত্র মেয়ে, দরকার হলে জামাইকে সাহায্য করবেন বৈ কি !

— বিয়ে হ'য়ে গেলে করবেন তা'তে বিশ্বাস কি ? তার চেয়ে আগেই কিছু বাগিয়ে নাও না !

—তাই কি হয় ! তারা অত বড় কুলীন ঘর, আগে থেকে সাহায্য করবে কেন ?

— আচ্ছা ভেবে দেখি।

—ভেবে দেখি না, করতেই হবে। খুব ভাল সম্বন্ধ, হাতছাড়া হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না।

আকবর আমজাদের পরামর্শ চাহিয়া চিঠি লিখিল। উত্তরে আমজাদ লিখিল- তুমি বিয়ে করবে কি না পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছ, সুখী হ'লাম। আমার মতে তোমার বিয়ে করাই উচিত। তুমি যখন সকলকে দেশ সেবায় দীক্ষিত করতে চাও, ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ সকলের আদর্শ দেশ-হিতৈষী জীবন যাপন করতে চাও আর বিয়ে প্রথা যখন উঠে যায় নি তখন কেমন ক'রে বিবাহিত জীবনে দেশ-হিত ব্রত উৎযাপন করা যায় তাই তোমার দেখান উচিত। তোমার হয়ত ভয় হতে পারে—বিয়ে করলে পাছে দেশ সেবার সঙ্কল্প টলে যায় বা ব্রত উৎযাপনে শক্তিহীন হয়ে পড়। তা যদি হয় জানতে হবে সঙ্কল্প তোমার খুবই দুর্ব্বল, দেশ সেবার মিশন তোমার খুবই unreal (অবাস্তব)। যে অবস্থায় দেশের কাজ তোমার নিজের পক্ষেই সম্ভব

নয়, কেমন ক'রে সে অবস্থায় পরকে দেশের কাজে প্রোৎসাহিত করবে ? দায়িত্বহীন সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ দায়িত্বপূর্ণ সংসার জীবন গ্রহণ করতে পারে কি ? নিজে আগে দেখাও কেমন ক'রে স্ত্রী-পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেও দেশের কাজ করা যায়। সেইখানেই তোমার আদর্শ ও মহত্ব। সেইখানেই তোমার true-patriotism (সত্যকার স্বদেশিকতা)। বিয়ে যদি করতে রাজী হও বিয়ের তারিখটা জানিয়ে চিঠি দিও। আমি হয়ত যেতে পারব না ; কেন না বি, সি, এস, এর জন্য খাটতে হচ্ছে, যদি পারি উপহার পাঠাব। পরীক্ষার পর আমি তোমাদের ওখানে একবার যাব চাচাজী ও মা'জানকে আমার সেলাম বলবে।

বিবাহের তারিখ পড়িয়া গেল। আয়োজন চলিতে লাগিল খানায়, সাজ সজ্জায়, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির। খানার আয়োজন দেখিয়া আকবর মা'কে গিয়া কহিল—মা, যে টাকাটা খানায় ব্যয় করবে সেটা আমায় দিলে আমি তা অন্য দরকারী কাজে লাগাতে পারি।

—খানা করাও দরকারী কাজ, এতদিন লোকের বিয়েতে খেয়ে এসেছ, আজ কি তাদের খাওয়ান উচিত নয় ?

—এতদিন লোকের বিয়েতে খেয়ে এসেছি, আমরাও খাওয়াইয়ে এসেছি আমাদের বিয়েতে। এখন আমরা আর খাবও না খাওয়াবও না।

—ছি, লোকে শুন্‌লে বলবে কি ? তোর ঐ যত পাগলামী মত। শুভ কাজে পাঁচজনকে খাওয়াইয়ে দোওয়া নিতে হয় না ?

—অমন দোওয়ায় আমার কাজ নেই, লোকে দোওয়া না করলেও আমার বিয়ে হবে। কতকগুলো জীব হত্যা ক'রে খাওয়া বরং আরো পাপের ভাগী হওয়া।

—দূর ! হালাল কাজকে ও কথা বল্‌তে নেই, গোণা হয়।

—না মা, হালাল কাজ না, কতকগুলি জীব হত্যা করে খাওয়া জ্যান্ত হারাম কাজ ?

—ও কথা বল্‌লে কেউ তোমাকে ভাল বল্‌বে না। তোমার বাপজানও শুনতে পেয়ে রাগ করবেন ও দুঃখিত হবেন। তিনি তোমাকে এত কষ্ট স্বীকার ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছেন কি তাঁর মতের বিরুদ্ধে চল্‌বার জন্য ?

—তাঁর মতে যদি আমাকে কোরবানী করতে বলে তিনি তাই করবেন না কি ?

—ইব্রাহিম পয়গম্বর ত করেছিল !

—ইব্রাহিম পয়গম্বর যে কালে করেছিল সে কাল চলে গেছে. একালে করলে আর কেউ কিছু না বলুক আমি তাকে পাগল বলব। একালে কোন আশমানী খোদার চেয়ে একটা জ্যান্ত প্রাণীর দাম অনেক বড়।

—দূর ! দূর ! ও কথা বল্‌লে তুই জ্যান্ত কাফের হয়ে যাবি।

—কাফের একবার নয় মা, একশ'বার হতে রাজী আছি, যদি ঐ আশমানী ভূতটাকে তোমাদের ভিতর থেকে তাড়াতে পারি।

এমন সময় কাজী সাহেব আসিয়া পড়িয়া কহিলেন—ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার এই যে ছেলে বলছে—খানা করতে পারবে না, খানার টাকাটা ওকে দিলে ও একটা কি দরকারি কাজে লাগাবে।

—ওর দরকার ত বুঝি—ধর্ম্ম নিন্দে করা ও খোদা রসুল না মানা ; কিন্তু সে সব আমি বেঁচে থাক্‌তে আর হচ্ছে না। দেশের কাজ করতে হয় টাকা রোজগার ক'রে করুক। আমার টাকা আমি যে ভাবেই খরচ করি করব, ওর তাতে কি ?

আকবর চুপি চুপি মা'কে গিয়া কহিল—কিন্তু আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে জীব হত্যা আমি কিছুতেই হতে দেব না। বিয়ে না হয় নেই করব। বাপ শুনিতে পাইয়া কহিলেন—বিয়ে না করে দূর হয়ে যা'ক, অমন ছেলে আমার না থাকাই ভাল। আকবর নিজে নিজেই কহিল—বেশ তাই! বাপ চলিয়া গেলে মা কহিলেন—তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছে কি অমনি অবাধ্য হ'তে?

—অবাধ্য আমি হইনি, তবে লেখাপড়া শেখে মানুষ চোখ কান ফোটাতে, চোখ ফুটলে মানুষ অনেক ভুল চুক দেখ্‌তে পায়। বাপের ভুল দেখিয়ে তার সংশোধনের উপায় করে দেওয়াই শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছেলের কাজ।

—কিন্তু বাপ যদি তা না মানে তবে কি লড়াই করবি?

—লড়াই করব না আবার ভুলের বশ্যও হব না।

—তবে?

—এই ত চলে যাচ্ছি।

—এত সব উদ্যোগ আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে না?

—যায় যাবে, কিংবা যদি পার অপর কাউকে দিয়ে এর সৎব্যবহার কর।

—দেশ সুদ্ধ লোক নেমন্তন্ন করা হল, তারা এসে কি করবে?

—বিয়ে দেবে।

—কাকে?

—বল্‌ছি ত আমার স্থানে অপর কা'কেও।

—কন্যা পক্ষ?

—তারাও যোগাড় ক'রে থাকে অপর একটা বর খুঁজে নেবে।

—দূর! কনের বয়স হয়েছে, তোকেই মনে মনে স্বামী কল্পনা করে আস্‌ছে; বিয়ে এক রকম হয়েই গিয়েছে বল্‌তে হবে—কলমাটি যা বাকী।

—বিয়ের মজলিসেও ত অনেক গোলমাল হয়ে বর উঠে যায়, পরে অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয়।

—ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই রকম করা তোর বিবেচনায় আসে?

আকবর তার ভাবী পত্নীর কল্পিত মুখখানি একবার ভাবিয়া লইল; পরে কহিল—আমি ত বল্‌ছিনে বিয়ে করব না! আমি বলছি কি যে আমার মতেই বিয়ে হ'ক।

—বাপ বেচে থাকতে ছেলের মতে বিয়ে হয়? পাগল!

—হয়, খুব হয়।

—কেমন ক'রে হয়? খানা করবি নে তবে এত সব লোক নেমন্তন্ন পেয়ে আস্‌ছে তাদের খাওয়াবি কি?

—ডাল আলু ভাতে—বড় জোর একটু মাছ।

—মাছও ত হত্যা কর্‌তে হয়।

—তবে একটু দুধ।

—সেও ত আর একজনের অধিকার কেড়ে খাওয়া!

—তবে শুধুই ভাজি তরকারি ডাল।

—লোকে কি বলবে?

—তারা জান্‌বে আমিই খানা করতে দিইনি।

—তুমি ছেলে হয়ে খানা করতে দাওনি বলবে—এ কেমন বাপ—কেমন ছেলে?

—দেখে শিখ্‌বে তারা।

—সে হয় না, সমাজে বাস করতে হলে সমাজ মেনে চলতে হয়, তা না হলে লোকে নিন্দে করে, এক ঘরে ক'রে রাখে।

—যে সমাজের লোককে সদ্ উদাহরণ দিলে খাপ্পা হয়, জানতে হবে সে সমাজ বিকারগ্রস্থ, তার চিকিৎসার দরকার।

—তা তুই যখন বড় হয়ে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখবি তখনই সমাজের চিকিৎসা করিস। এখন মেনে চল। দেখ তোকে মিনতি করে বলছি অবাধ্য হ'স নে।

মা'র মিনতি করার কথায় আকবর একটু নরম হইয়া কহিল—তুমি যদি দুঃখিত হও মা, আমি অবাধ্য হচ্ছিনে। তবে একটা কথা—খানার কোন কাজে আমি যোগ দিতে পারব না।

—তা দিসনে।

খুব ধুমধামের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। নব বধূ বাড়ী আসিল। বলা বাহুল্য বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক স্ত্রীকুটুম্বও আসিয়াছিলেন; তাঁর মধ্যে আকবরের নানীও (মাতামহী)। নানী প্রায়ই নব বধুকে কাছে লইয়া থাকিতেন। সে দিন ঘরে যখন নানী ও বধূ ছাড়া আর কেউ ছিল না, আকবর কি দরকারে ঘরে আসিলে নানী কহিলেন—বিয়ে করে কি বউ আমাদের দিয়ে গেলি? একদিনও ত একবার দেখবার ইচ্ছে করলি নে।

— দেখ্‌তে ত ইচ্ছে হয়, কিন্তু তোমরা দেখ্‌তে দাও কিনা!

— তোর বউ তুই দেখ্‌বি না ত দেখ্‌বে কে?

- কি জানি আমি মনে করেছিলাম—তোমাদের দেখে পেট ভ'রে গেলে আমায় দেবে।

—হ্যাঁ, আমাদের পেট বিলক্ষণ ভরেছে এখন তুমি নিয়ে নিলেই আমরা একটু বিশ্রাম করি।

ঘোমটা-মোড়া বধূ ঘরের এক কোণে বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া হয়ত শুনিতেছিল। আকবর উৎসুক আগ্রহে নানীকে কহিল - সত্যি নানী, একবার ত দেখালে না!

নানী উঠিয়া গিয়া - "ওলো আই, বর ডাক্‌ছে; ঘোম্‌টা খোল দেখা" বলিয়া সঙ্কুচিতা বধুর হাত ধরিয়া টানিলেন। বধূ আপত্তি করিল। নানী একটু সজোরেই টানিয়া আনিয়া আকবরের উৎসুক দৃষ্টির সাম্‌নে ঘোমটা খুলিয়া দিয়া মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—কেমন পছন্দ হয়?

আকবর মুদিত-চক্ষু বধুর দিকে ভালমত না দেখিয়াই যেন তৈয়ারি করা কথায় কহিল—হাঁ বেশ বউ!

—হাঁ বেশ বউ—ভালমত না দেখেই বেশ বউ! লজ্জা করছিস বুঝি আমার সামনে?

"চোখ বুজে রইলি কেন তুই, হ্যালো? দেখ তুইও দেখ্—তুজনেই তুজনকে ভাল করে দেখ"। বলিয়া নানী তাদের তুজনকে সেখানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

আকবর বধুকে একেলা পাইয়া আস্তে আস্তে ভিতর হইতে খিল আটিয়া দিল। পরে বসাইবার ছলে তাহাকে বিছানার দিকে আকর্ষণ করিল। বধু সে আকর্ষণে একটুও নড়িতে চাহিল না। আকবর কহিল দেখ, আমি তোমার সঙ্গে বেশীক্ষণ এখানে লড়াই করতে পারব না—আমার অনেক কাজ আছে, এখনই কে ডাক্‌বে।

বধু কিন্তু যথা পুর্ব্বং তথা পরং। আকবর কহিল—আচ্ছা ঘোমটাটা খোল ত মুখখানা দেখি!

বধু চুপ!

—আচ্ছা আমি তবে খুলে নিতে পারি? আকবর খুলিবার চেষ্টা পাইল—বধু বাধা দিল—সে আর জোর করিল না।

—তোমার নামটা কি?

বধু নিরুত্তর!

—আমার দিকে একবার তাকাও ত! আমাকে পছন্দ হয় তোমার? পড়তে জান তুমি?

আকবর উপর্য্যুপরি এতগুলি প্রশ্ন করিয়া গেল, বধু কিন্তু একটারও জবাব দিল না। হঠাৎ আকবরের মনে হইল—পাঁচজনের জোর জবরদস্তিতে বা প্ররোচনায় কবুল কলেমা পাঠ করিলেই কোন

স্ত্রীলোকের প্রতি ন্যায়তঃ স্বামীত্বের অধিকার জন্মায় না। সে তাহার বিনা অনুমতিতে তাহাকে স্পর্শ করিয়া হয়ত ঠিক করে নাই—হয়ত সে তাহাতে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাই কোন কথা বলে না। ক্ষমা প্রার্থনার ছলে কহিল—আমাকে মাপ কর। তোমার বিনানুমতিতে আমি তোমাকে ছু'য়ে ফেলেছি। আমি তোমাকে "তুমি" বলছি, যেহেতু তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট—নাবালিকা বল্লেই হয়। যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে বিয়ে না করে থাক, বলো; আমি তোমাকে আমার থেকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছি। এখনও তোমার সতীত্ব ঠিক অটুট আছে।

বধূ নিরুত্তর।

বাহির হইতে কে ডাকিল—আকবর! আকবর তাড়াতাড়ী দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ডাকছিলেন যিনি তিনি আকবরের বড় ভাই। তাহাদের লইতে শ্বশুরালয় হইতে পাল্‌কী সমেত বেহারা আসিয়াছে, সেই বেহারাদের তদ্‌বির তাগিদের জন্য।

কাজ শেষ করিয়া আকবরের একটা ভাব মনে আসিল। সে নিরালায় কাগজ পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসিল। খানিক ভাবিয়া লইয়া লিখিল—

এতও করিয়া সাধিলাম তারে কথাটী কহিল না,
মুখটী তুলিয়া কোন কিছু ছলে বারেকও চাহিল না;
শুধু ঘোম্‌টা মুড়িয়া নিচু পানে মুখ হাটু বিছে মাথা গুঁজি
রহিল সে বসি যেন কোন ঋষি নিশ্চলই সোজাসুজি॥

আজ কয়েকদিন হইল আকবর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। আকবরের শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন, শ্যালক শ্যালিকারাও আছে। শ্বশুর খুব প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মহাজন ও গাতিদার। এ অঞ্চলের তিনিই "বড় মিঞা"। ছোট খাট মোকদ্দমার বিচার আচার তাহার কাছেই হয়। প্রায় প্রতিদিন অসংখ্য লোক দ্বারা তাহার বৈঠক ঘর পূর্ণ থাকে। কেউ বিচার প্রার্থী, কেউ পরামর্শ, কেউ টাকা। খাতকদের ভিতর অনেকেই পুরুষ পরম্পরায় তাহার কাছে ঋণী; ঋণ ক্রমশঃ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া চলিয়াছে; কেউ ভিটে মাটি ছাড়িয়া দিয়া হয়ত আংশিক রেহাই পাইয়া আজও কোন প্রকারে টিকিয়া আছে; কেউ সর্ব্বস্ব হারা হইয়া শেষে পুত্র কন্যার জীবন সত্ব লিখিয়া দিয়াছে। চারি দিকে গোলার সারি দেখিলে মনে হয় যেন গোলার প্রসব শক্তি আছে; ক্রমশঃ অনেক—অসংখ্য।

আকবরের শ্বশুর গল্প করেন—তিনিই এ অঞ্চলের ভাত কাপড় অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোকই তাহার খাতক, কেউ ব্যবসায় সূত্রে, কেউ পেটের দায়ে, কেউ জাকজমকের সঙ্গে একমাত্র ছেলে বা মেয়ের বিবাহ সম্পাদনে। শ্বশুরের পাকা বাড়ী অর্থাৎ ইটের গাথা—আর কোন প্রকার কারুকার্য্য বা শিল্প-চাতুর্য্য তাহাতে নাই। ঘরে আগুন লাগার ভয়েই বোধ হয় করা। ভিতর বাড়ীর প্রাঙ্গণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই নাই। বার মাসে একদিনও ঝাট দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। সঞ্চিত জঞ্জাল ও ছাই মাটি পচিয়া

দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে তবু সেগুলি তেমনি আছে। ইটের প্রাচীরের গায়ে গোবরের ঘুটে শুকান হয়। ঘুটের অবশিষ্ট অংশ লাগিয়া থাকিয়া এমন দেখায় যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই ইট দিয়া প্রাচীর গাথা হইয়াছিল—ইটের সৌন্দর্য্য পাছে কোন ছলে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই ভয়েই বোধ হয় খুব বিবেচনার সঙ্গে সেটাকে জঘন্য অপমানে ম্লান প্রতিরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আকবরের মনে হইল অর্থ সম্পদই এ লোকটার একমাত্র প্রার্থনীয় ও উপাস্য বিষয়! তাহাছাড়া অন্য কোন দিকে ইহার খেয়াল বা রুচি কোন দিন ভুল করিয়াও চাহে নাই। সে দিন একজন অতিথি আসিয়াছিল, তাহাকে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইল—সেখানে যায়গা হইবে না। সব দেখিয়া শুনিয়া আকবর ভাবিল—ইহারাই আবার কুলীন! কোন আদিম যুগের কোন পূর্ব্ব পুরুষ হয়ত খুব বড় রকমের একটা খানা করিয়াছিল সেই অবধি নাম হইয়াছে—কুলীন!

শ্বশুরের প্রকাণ্ড গোষ্টি, প্রতিদিন একজন না একজনের বাড়ীতে দাওয়াত থাকে। মাংসই প্রধান ভোজ্য। উপর্য্যোপরি মাংস খাইয়া আকবরের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে কিছুদিন মাংসাহারে বিরতি দিয়া নিছক নিরামিষ খাইতে ইচ্ছা করিল। অনেকে টিট্‌কারি কাটিল—অভ্যাস নেই খাবে কি? ঘর দেখে কি মানুষ সাধে? আকবর খুব সাদা সিদা পোষাকে বেড়ায়, সাদা সিদা কথা লইয়া থাকে। কোথায় কারা খুব বড় কুলীন সে সম্বন্ধে প্রায়ই কথাবার্ত্তা হয় সে চুপ করিয়া শুনে কোন কথা বলে না; তাহাতে অনেকেই ভাবে—বি, এ পাশ করিলে কি হয়, স্বভাব যায় ম'লে—এ সব কথা জানবে কোথা থেকে? আকবর মনে মনে একটু হাসে।

তরুণ বয়স্কদের মধ্যে যাহারা একটু লেখাপড়া জানে, কোন হাই-স্কুলের ফোর্থ থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহারাই কেবল তাহাকে একটু ভক্তি মিশ্রিত বিস্ময়ের চক্ষে দেখে। আকবর তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে চায় কিন্তু পারে না, এই জন্য যে সে ছেলে বেলা হইতেই নিরালার উপাসক। তাহাতে কেউ কেউ তাহাকে একটু অহঙ্কারীও বলিত।

আকবরের শ্বশুরবাড়ী খুব ভাল লাগিল না তবু সে টিকিয়া রহিল কি যেন একটা আশার মোহে। আজও সে তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখে নাই—তার সংস্পর্শও পায় নাই তবু সে আশায় ও চেষ্টায় আছে। সে ভিতর বাড়ীতে আসিলে বধু প্রায়ই তাহাকে লুকাইয়া দেখে কিন্তু লক্ষ্য করিলেই ছুটিয়া পালায়। তাহাতে তাহার বিশ্বাস হইয়াছে বধু তাহার প্রতি একান্ত উদাসীনা নয়। বধু তাহাকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই সে তাহার সম্বন্ধে অমন সজাগ। তাহা ছাড়া সে ইদানীং ভাবিয়া দেখিয়াছে মুসলমান সমাজের কোন মেয়ে তাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে যাহার তাহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ না করিয়াই পারে না। পিতা মাতার হাত দিয়া সে যাহা পায় তাহাকে সে আসমানের চাঁদ মনে করিয়া লইতেই বাধ্য- তাহার কোন পছন্দ অপছন্দ করিবার অধিকার নাই—খারাপ হইলেও সে তাহার ভাগ্য।

অনেক কৌশলে সে একদিন কথা পাড়িল শ্যালিকাদের কাছে। শেষে একদিন দিন ধার্য্য হইল—ফুল-শয্যার।

আজ ফুল-শয্যা—বধুকে সাজাইয়া গুছাইয়া অনেক পীড়াপীড়িতে ঘরে পৌছাইয়া দেওয়া হইল। রাত তখন ১০ টা। আকবর অতীব

আগ্রহের সহিত ঘরে গিয়া পরম তৃষ্ণায় এদিক ওদিক চাহিল; দেখিল—ঘরের এক কোণে অতি সঙ্কুচিত ও জড়সড় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে সে। আকবর তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে গিয়া গাত্র স্পর্শ করিয়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে কহিল—এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে কেন—আমাকে দেখে ভয় কি—আমি ত আর অন্য কেউ না—আমি তোমার স্বামী—জীবন মরণের সাথী—কি বল—আজ হতে তুমি আমার, না ?

বধু অসাড় চুপ !

আকবর আশা করিয়া আসিয়াছিল—বধু আজ নিশ্চয় তাহার সঙ্গে স্বেচ্ছায় প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবে, তাহার বুক ভরা স্নেহ ও প্রীতির আকর্ষণে একান্ত করিয়া ধরা দিবে। কিন্তু কই, এ যে সেই তেমনি ! আকবর একটু উৎসাহ হারা হইল কিন্তু হাল ছাড়িল না। বার বার চেষ্টা করিল। বধু কিন্তু তেমনি অজ্ঞেয় ! সে হতাশ অবসন্ন হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল ও ক্লান্ত চিত্তে নানান কিছু ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল। বধু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন শয্যা গ্রহণ করিল আকবর বোধ হয় তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

আকবর বিবাহের পূর্ব্বে সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল—বধু বেশ সুন্দরী ও লেখা পড়া জানা ; কিন্তু এই ভাবে সময়ে সঠিক পরিচয় লইতে গিয়া হতাশ হইয়া ভাবিল—সে নিশ্চয়ই প্রতারিত হইয়াছে। তাহার অভিভাবক ও বিবাহের অন্যান্য উদ্যোগিরা মতলব করিয়াই নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাহাকে এই বিবাহ দিয়াছে। বস্তুতঃ বধুর বিদ্যাবুদ্ধি ও অন্যান্য পরিচয় সম্বন্ধে সমস্ত কথাই একেবারে অত্যুক্তি। যে মেয়ে বাস্তবিকই লেখাপড়া জানে সে কি অমন শত পীড়াপীড়িতেও চুপ থাকে ? যে মেয়ে যথার্থই সুশ্রী সে কি অমন প্রাণ পণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করে ? অভিভাবকদের উপর তাহার কম রাগ হইল না। তাহাদের উদ্দেশ্য খুঁজিতে গিয়া সে বুঝিল—নিছক কুলীন ঘর বলিয়াই বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের তৃপ্তি সাধনের জন্যই তাহাকে তাহারা অমন একটা নিরেট কাঠ দেবতার কাছে নির্ম্মম ভাবে বলি দিয়াছে। আর এ শুধু তাহার বেলায় নয়, সমাজের সর্ব্বত্রই অমনি হইয়া থাকে। বিবাহে বর-কনের কোন মতামত বা নির্ব্বাচনের অধিকার নাই ; সমস্তই বিরুদ্ধ রুচি বৃদ্ধ অভিভাবক ও ভাগ্যের অনির্দ্দিষ্ট অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। ফলে, অধিকাংশ স্থলেই বিবাহ অমিল ও অসামঞ্জস্যে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সেটা কি ঠিক ? আমরণ যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে জীবনের একমাত্র সঙ্গী বা সঙ্গিনী করিয়া কাল কাটাইতে হইবে, সে যদি তেমন মনের মত না হয় তবে কি মিথ্যার সেই

বিবাহ! কি বিড়ম্বনার সেই জীবন! আকবর বুঝিল এমনি করিয়া শতদিক দিয়া গোঁজামিল দিয়াই এ জাতিটা মরিতেছে যক্ষ্মা রোগীর মত তিলে তিলে। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আসক্ত, শিক্ষা দীক্ষায় ও রুচিতে এক হইলে মিলিয়া মিশিয়া যে সুখে কাল কাটাইতে পারে—পারিবারিক জীবন এক অম্লান মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে মুসলমান সমাজে তাহা কৈ! স্বামী যদি যায় একদিকে, স্ত্রী অন্যদিকে যায়, ফলে উভয়ের বিরুদ্ধতায় সংঘর্ষে ও টানাটানিতে আজীবন অতি দুঃখে ও অশান্তিতে কাল কাটাইয়া শেষে মৃত্যুর হাতে গিয়া রেহাই পায়। কোন কোন যায়গায় একটা আপোষ হইলেও সে নিতান্ত গোঁজামিল। কিন্তু ইহাই কি জীবন? সকল বিষয়ে এই নিষ্ঠুর অভিভাবকত্ব মনুষ্যত্বের এক চরম অবমাননা নয় কি? নিজের চোখ কান হাত পা থাকিতেও এখানকার মানুষের তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। সব ভার অভিভাবকের উপর। তাই এ জাতির লোক কখন নাবালক ছাড়ায় না। আমরণ যে খোকা সেই খোকাই থাকিয়া যায়। ধর্ম্মে, রাজনীতিতে, সমাজে ও সব তাতেই ঐ এক কথা। সব ভার পরের উপর। নিজে একদম নির্ভর; নিশ্চেষ্ট, দুর্ব্বল, নিঃস্ব। বাহিরের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে হয়ত ভালই দেখায়। কিন্তু অভিভাবকত্বেরও অপব্যবহার আছে। সংসার এমন একটা জায়গা যেখানে সব সময়ে অভিভাবক মিলে না বা মিলিলেও তাহা কার্য্যকরী হয় না। এখানে পদে পদে আত্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরতা ও আত্মনিষ্ঠারই দরকার। যে ব্যক্তি চিরকাল পরের উপর নির্ভর করিয়া নিজে হাটিতে শিখে নাই, সে সময়ে কোন হিংস্র বন্য জন্তুর তাড়ায় দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

কিছুদিন চুপ থাকিয়া আকবর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা করিল। শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন বাবা, এত শীগ্‌গির? সে বুঝাইয়া বলিল—কলিকাতায় কোন বিশেষ কাজ আছে। শ্বশুর আপত্তি করিলেন না। যাইবার দিনে গাড়ী প্রস্তুত হইয়া আসিল; সেই সঙ্গে অনেক আসবাব পত্রও, যেমন থালা, ঘটি, বাটী প্রভৃতি। আকবর জিজ্ঞাসা করিল—এ গুলো কেন? উত্তরে শ্বশুর বলিলেন—জামাই বিদায়-কালে ওসব দিতে হয়।

—কেন দিতে হয়? জামায়ের ত ওসব কিছুর অভাব নাই।

—অভাব না থাক্‌লেও দিতে হয়, সামাজিক নিয়ম।

—কিন্তু নিয়মেরও ত একটা অর্থ আছে?

শ্বশুর সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় জনৈক যুবক সমাজ-তত্ত্ববিদ্ কহিলেন—দিতে হয় যেহেতু মেয়েরও বাপের সম্পত্তিতে একটা অংশ আছে; কিন্তু সম্পত্তি ভাগ করিয়া কোন মেয়ে সে অংশ কখন গ্রহণ করে না। তাই মেয়ে বা জামাই বিদায়কালে এসব দিতে হয়।

—কিন্তু এসব জিনিষের ত দরকার নেই আমার!

—দরকার আজ নেই, কিন্তু একদিন হবে; ভাই ভাই ঠাই ঠাই!

—কোন ভবিষ্যতে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হব আজই সেজন্য প্রস্তুত হওয়া আমার বিবেচনায় আসে না। তার চেয়ে আমার দরকার মত কিছু দিলে কাজ হত।

—তোমার দরকার হয়ত এমন একটা জিনিষের যা নাকি আমাদের ক্ষমতার অসাধ্য কি ক'রে তা দেব?

অনর্থক বিবেচনায় আকবর আর তর্ক করিতে চাহিল না। শ্বশুর যে কৃপণ তাহাতে তাহার কাছে নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু আশা

করা বৃথা। তাই সে অগত্যা লোকমতের খাতিরেও সে সব লইতে রাজী হইল।

আকবরের শ্বশুর যেমন বড়লোক ও আকবর যেমন শিক্ষিত ও উপযুক্ত তাহাতে গ্রামের সকলেই আশা করিয়াছিল—গাড়ী ভর্ত্তি করিয়া জিনিস পত্র দিবে। দীর্ঘ ছ' ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী যখন বাড়ীর নিকটে পৌছিল অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কি কি জিনিষ দিয়াছে। গাড়োয়ান না থাকিলে আকবরকে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে অপ্রস্তুত হইতে হইত নিশ্চয়। বাড়ী পৌছিলে পড়শিরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—শ্বশুরবাড়ী কেমন লাগল ?

—বেশ লেগেছে !

—বউ ?

—খুব ভাল।

মা কহিলেন—এখন সংসার হ'ল—খেলা ক'রে বেড়ালে ত আর চলবে না—উন্নতির চেষ্টা দেখ।

—সংসার হয়েছে বটে মা, কিন্তু এমন প্রতারণা আমি আশা করিনি।

—প্রতারণা কিসের ?

আকবর খানিক মৌনী থাকিয়া কহিল—ঐটাই কি আমার যোগ্য পাত্রী তোমার বিবেচনায় আসে মা ?

—ওর চেয়ে আর যোগ্য পাত্রী কোথায় আছে ?

—নেই হয়ত তোমাদের ঐ পাড়াগাঁয়ে চাষা সমাজে, তাই বলে কি কোথাও নেই ?

—তবে কি তুই মেম বিয়ে করতে চাস? এই জন্যেই লোকে বলে—ছেলেকে ইংরাজী শেখাতে নেই—বিগ্‌ড়ে যায়।

আকবর ক্রোধ ও ক্ষোভের উত্তেজনা চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কাজী সাহেব বাড়ী আসিলে মা কহিলেন—ছেলের কিন্তু বউ পছন্দ হয়নি।

—কেন?

—কি জানি!

"পছন্দ না হয়ে থাকে হয়েছে, আমি ত আর সৃষ্টি কর্ত্তা নই যে তার ফরমাস মত একটা গড়ে দেব! আমার মতে যা ভাল মিলেছে দিইছি; পছন্দ না হয়ে থাকে বেশ; আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি তার ইচ্ছে হয় নিজের পছন্দ মত অন্য একটা ক'রে নিক। কিন্তু আমার ঘাড়ে চেপে অমন অন্যায় আস্ফালন আমি আর সহ্য করব না। তাকে তার নিজের পথ দেখে নিতে বলো, তার পরে আমার যা কর্ত্তব্য ছিল শেষ হয়েছে।" আকবর আড়াল হইতে কথাগুলি শুনিয়া ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ আক্রোশে নিজে নিজেই গর্জ্জাইতে লাগিল। রাতটা কোন রকমে কাটাইয়া প্রত্যূষে কলিকাতা রওনা হইল। দেশ সেবার সঙ্কল্প আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সে মনস্থ করিল—একটা চাকুরি করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়া পরে অভিষ্ট বিষয়ের কাজে লাগিবে। নিছক পরের উপরে ভর করিয়া কোন কিছুই সম্ভব হয় না।

কলিকাতায় আসিয়া পরে যাহা ঘটিয়াছিল প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

(৯)

দুপুর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া আমজাদ চাহিয়া দেখিল—আকবর টেবিলে বাতি জ্বালাইয়া কি লিখিতেছে। এই প্রকার লেখার অভ্যাস আকবরের আজ নূতন নয় আমজাদ তাহা জানিত; তাই সে কিছু না বলিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া প্রথমেই আমজাদ আকবরকে কহিল—কৈ কি লিখ্‌ছিলে দেখি!

—তুমি কি ক'রে টের পেলে?

—আমার তখন ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আকবর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিল—স্বপ্নঘোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ভাব মনে এল, তাই লিখিলাম; কিন্তু তুমি যা মনে করছ তা নয় অর্থাৎ কবিতাও নয় প্রবন্ধও নয়। একটা প্রেমের ব্যাপার—ভাল লাগ্‌বে তোমার?

—প্রেমের ব্যাপার ভাল লাগে না কার? বিশেষ ক'রে আমিত আর পিউরিট্যানিক খৃষ্টান নই, অথবা বাবা কার্ত্তিকেরও শিষ্য নই। আমি মুসলমান, মহাম্মদের শিষ্য—মহাম্মদের মত প্রেমিক মানুষ জগতে আর কয়জন আছে?

আকবর তেমনি মৃদু হাসিয়া কহিল—তা ঠিক! পরে লেখাটা তার হাতে দিল। আমজাদ পড়িতে লাগিল—

প্রিয় জাহানারা,

যতদিন তোমার কাছে ছিলাম বুঝি নাই তুমি আমার কে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার বিচার ও বিবেচনার বিষয় ছিল তোমার রূপ অর্থাৎ

চেহারাটা। সত্য কথা অকপটে স্বীকার করায় কোন দোষ নাই—আমি সেটাকে তেমন করে ভালবাসতে পারি নি। তাই কতবার ঝরে পড়া প্রেম নিবেদনের ছলে তোমার কাছে গিয়ে কেবলই তোমাকে উৎপীড়ন করেছি। আজ এই দূর প্রবাসে—তোমা হতে বিচ্ছেদের এই নিদারুণ কঠোর মুহূর্তে আমার কেবলই মনে পড়ছে, তোমার প্রাণখানি, যে প্রাণ নিয়ে বলেছিলে—তুমি আমার—আমার জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদবে (ঠিক মুখ ফুটিয়া না বলিলেও ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়াছিল)

আজ আমি সত্যি ক'রে উপলব্ধি করছি মানুষের আসলরূপ তার মুখে নয় বুকের ভিতর। মানুষের বাইরের রূপ যত বড়ই উজ্জ্বল ও চাকচিক্যশালী হউক না কেন, তার এই অন্তরের সৌন্দর্য্যের কাছে তা নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য। তোমার ঐ অন্তরের সৌন্দর্য্যকেই তাই আজ আমি এতদূর থেকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করছি। যদি কোন দিন কোন মুহূর্ত্তে তোমার ঐ আসল রূপ, সৌন্দর্য্যের ঐ চিরন্তন উৎসকে উপলব্ধি করতে না পেরে উপেক্ষা বা অবহেলা ক'রে থাকি সেজন্য আমি এখন তোমার মাফ্ চাচ্ছি।

আমি ছিলাম এতদিন একেলা কারও কিছু ধার ধারতাম না, কোন কিছুই পরোয়া করতাম না। দুনিয়ার ঝড় তুফান, দুঃখ কষ্ট, বিপদ আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতাম। আজ কিন্তু দুনিয়া আর তোমাকে দিয়ে আমায় অতি কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। তোমার হয়ে আজ আমায় মানতে হচ্ছে—দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, বেহেস্ত আছে, দোজখ আছে, তুমি যা মান তা সব আছে। যতদিন তুমি যার থেকে মুক্ত নও ততদিন আমিও তার থেকে মুক্ত নই। আজ কত কথা অবিশ্রান্ত কলমের মুখে নেমে আস্ছে, কিন্তু সব কি লিখতে

পারি? তুমি যে নিজে পড়তে জান না। যদি কোনদিন পড়তে শেখ—সেই দিন জানাব যে কত কথা।

ভালকথা আমি তোমাকে পড়তে ব'লে এসেছিলাম, পড়ছ কি? প্রাণময়ী প্রেয়সী আমার! আমি যে তোমাকে আরও বড় ক'রে পেতে চাই! আশা আমার পূর্ণ হবে কি? তা যদি হয়, সত্যি আমি নিজকে সৌভাগ্যবান ব'লে মনে করব। আজ রাত্রে স্বপ্নে তোমাকে দেখেছিলাম—ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে বিরহের ব্যথায় কান্না এল—সে কান্না এখনও ফুরুচ্ছে না। জানি না কতদিনে আবার তোমার দেখা পাব। বাসন্তিপুরের সেই মাঠ, সেই বন, সেই সব আজ কত নিবিড় মাধুরিতে পূর্ণ হয়ে শত হাতছানিতে কত দুর্নিবার প্রাণ-মোহন আকর্ষণে আমাকে ডাকছে, কিন্তু আমার সম্মুখে একদিকে লোক লজ্জা ও সংসার দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর প্রতিরোধ, অন্যদিকে দুরন্ত কাল সমুদ্রের কঠোর ব্যবধান পথ আগ্‌লে ব'সে আছে। শুধু ভাবাকুল ভাবাহারা কাতর নয়নে চেয়ে আছি—কবে আমার দিন ফুরাবে, কবে আবার দেখা পাব। জাহান্, লক্ষ্মী! আমার কথা ভাব তুমি, আমার কথা মনে পড়ে তোমার? বড় ব্যথায় কলম ছাড়তে হ'ল! এখন আমি আসি!

পড়া শেষ করিয়াই আমজাদ কহিল - ব্যাপারটা কি বুঝলাম না ত!

আকবর কহিতে লাগিল - জানই ত বাড়ীতে সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছিলাম—তার পর এখানকার ঐ ব্যাপার—হয়ত একটা দুর্ব্বল sentiment (ভাবপ্রবণতা) এর খাতিরে অনেক দিনের খুঁজে পাওয়া চাকুরিটা প্রত্যাখান ক'রে এলাম। ইত্যাকার নানান ব্যাপারে মনটা ভারি দুর্ব্বল অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। রাত্রে ঘুমিয়ে আছি। স্বপ্ন দেখছি—যেন আমি নিদারুণ রোগ যন্ত্রণায়

পীড়িত—সকলেই আমাকে অকর্ম্মণ্য বোঝা বোধে ত্যাগ করেছে—কেউ কাছে নেই, এমন সময় সে—আমার উপেক্ষিতা অবজ্ঞাতা স্ত্রী—খানিক দূরে, সেবার অধিকার প্রার্থনা করে অনুমতির অপেক্ষায় প্রাণের ব্যাকুলতায় করুণ কাতর দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবলাম—উঃ কি নিষ্ঠুর আমি! আমি কাকে অবজ্ঞা করেছি? সে যে একটা পরিপূর্ণ প্রাণ—একটা অটুট অতুল সৌন্দর্য্য—আমার দুর্ভাগা জীবনের এক অসামান্য উপহার! বুক ভ'রে আমার কান্না এল। আর ঘুমুতে পারলাম না—তার পরেই লিখলাম এই চিঠিখানা। কেমন, পাঠান যায়?

আমজাদ কহিল—বউ কি লেখাপড়া জানে?

—শুনেছিলাম জানে কিন্তু আমার বিশ্বাস সে জানে না।

—তবে কে পড়বে?

—শুনেছিলাম পাড়ার কে একজন মেয়ে আছে, সে বেশ লেখা পড়া জানে।

—সে কি তোমার ঐ কবিত্বপূর্ণ চিঠি পড়ে অর্থ করতে পারবে?

—তবে কি পাঠাব না?

—না, পাঠিয়ে দাও, তোমার শ্বশুর জানতে পারলে হয়ত মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার বন্দোবস্ত করতে পারবেন। এখনও সময় আছে।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আমজাদের বি, সি, এস পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার এখন কর্ম্মমুক্তি। পরীক্ষা শেষ করিয়া একবার বাড়ী গিয়াছিল, ফল বাহির হইবার প্রতীক্ষায় এখন কলিকাতায় আছে। প্রত্যহ বৈকালে দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হয়—গড়ের মাঠে গঙ্গার ধারে। অনেক তর্ক বিতর্ক ও কথাবার্ত্তা হয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, প্রভৃতি সম্বন্ধে। বৈকালে চিঠিখানি পোষ্ট করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমজাদ আকবরকে কহিল—এখন কি করবে মনে করছ—একটা ত কিছু ক'রতে হবে।

—কি করব ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারিনি, তবে ভাবছি!

—আমার উপদেশ নাও—একটা মাষ্টারি নাও, তাতে তোমার সংসার চল্‌বে - দেশ সেবাও হবে। অনেক স্কুলই ভাল মাষ্টার পায় না।

—মাষ্টারি হয়ত নিতে পারি অনন্যোপায়ে পেটের দায়ে, কিন্তু দেশ সেবার হেতুরূপে নয়।

– কেন, মাষ্টারিতে দেশ সেবা হয় না বল্‌তে চাও?

—কি করে হয়? লেখা পড়া শিখে যারা পাশ করে তারা সত্যিই মানুষ হয় বল্‌তে চাও? আমার কিন্তু তাতে ঘোর সন্দেহ আছে। তবে যদি শিক্ষার মানে জিজ্ঞেস কর আমি বল্‌ব Education is the art of robbery. স্কুল কলেজে দস্যুবৃত্তিই শেখান হয়। ফল দেখেই বৃক্ষের বিচার—দুনিয়াটা যারা ভোগ করছে তারাই কি

শিক্ষিত লোক না? অথচ এই ভোগের উপাদান যারা জোগায় সেই হাজার করা ৯৯৯ জন অশিক্ষিত চাষী বা কলের মজুর শিক্ষার সমস্ত সুযোগ হতে যারা বঞ্চিত যা'দের দুর্ভাগ্য জীবন বেড়ে উঠ্‌ছে এই সব শিক্ষিতদের জন্য খেটে মরতে। সত্যি বটে অনেক শিক্ষিতই আবার খেতে পায় না, তার কারণ তাদেরই শিক্ষার মূলে; তারাই যদি আবার লাটসাহেব অথবা তেমন কেউ হ'তে পারত তারাই তবে আবার সহস্র লোকের উপজীবিকা বেমালুম লুট করত। মোটের উপরে কথা এই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ আজও ঠিক ধরা পড়েনি; বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মূলে আত্মপুষ্টি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আছে কিন্তু বিশ্ব-হিত ব্রতের আদর্শ নেই, তাই যত গোলমাল; তাই অনেক শিক্ষিতই খেতে পায় না, আবার শিক্ষিতই দুনিয়ার মালিক।

বর্ত্তমান দুনিয়ার ব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব ও যোগ্যতা দুইটা আলাদা জিনিষ। যোগ্যতার দাম আছে কিন্তু মনুষ্যত্বের দাম নেই; লাট সাহেবের যোগ্যতা আছে তাই তিনি লাট সাহেব কিন্তু তার মনুষ্যত্ব নাই তাই তিনি হৃদয়হীন, তাই নিরন্ন সহস্র প্রজার দুঃখ কষ্ট নিবারণে তার মাসিক ২০।২৫ হাজারের এক পয়সাও তিনি কম পান না অথবা লন না—সহস্র প্রজার কাতর হাহাকারেও তার প্রাণে একটুও সাড়া জাগে না। মনুষ্যত্বের দাম নেই, যেহেতু অমনুষ্যত্বের দাম আছে আর অমনুষ্যত্বের দাম থাকা মানেই মনুষ্যত্বের বিনাশ সাধন করা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে Competition, emulation, freedom of enterprise (প্রতিযোগিতা, চেষ্টার স্বাধীনতা) প্রভৃতি যদি না থাকে মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চালাবে

কে? আমি বলব—মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বও উন্নতি চায়। তবে মনুষ্যত্বের উন্নতিতে আর প্রতিযোগীতার উন্নতিতে একটু তফাৎ আছে। বর্ত্তমান দুনিয়ার উন্নতি বলিতে যা বুঝায় তা ঐ শেষোক্ত প্রকারের উন্নতি—It is the growth of the individual at the expense of the general. সবাইকে মেরে একজনের বড় হওয়া। প্রতিযোগিতায় যে হেরেছে সেই নীচে প'ড়ে গেছে, আর তারই বুকের রক্ত দিয়ে ধনীর প্রমোদ কক্ষ—বিলাসীর আরাম আগার নির্ম্মিত হচ্ছে। আর জলকালো অক্ষরে তারই নাম দেওয়া হয়েছে—দুনিয়ার উন্নতি। বাঃ! কি চমৎকার উন্নতি! একদিকে বিলাসী মোটর হাকিয়ে মুহূর্ত্তে লক্ষ টাকা উড়াচ্ছে, অন্যদিকে নিঃস্ব দরিদ্র একটা পয়সার দায়ে ক্ষিদেয় পেটে পাথর বেঁধে ধুলোয় পড়ে খাবি খাচ্ছে।

মনুষ্যত্বও উন্নতি চায়, তবে নিজের জন্য ততটা নয় যতটা তার নিজের দ্বারা পরের জন্য। সন্তানের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি নিজের দ্বারা বাপ মা'কে সুখী করে, বাপ মা'রও শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি নিজের দ্বারা সন্তানের মঙ্গল বিধান করে। যেখানে স্নেহ, প্রীতি, মহব্বৎ প্রতিযোগিতায় বড় হওয়া সেখানে আসে না; স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা থাকার নামই মনুষ্যত্ব।

—মোটের উপর তুমি বল্‌তে চাও প্রতিযোগিতায় দরকার নেই দুনিয়ার?

—প্রতিযোগিতার দরকার নেই আমি তা বলছিনে, আমি শুধু বলছি কি যে প্রতিযোগিতায় মনুষ্যত্বের প্রেরণা নেই, আছে কেবল হীন স্বার্থপরতা, অর্থ লালসা ও প্রভুত্বের কামনা সেই নীচ

প্রতিযোগিতা না থাক্‌লেই দুনিয়ার মঙ্গল। গান্ধি, সি, আর, দাস বা কামালের যোগ্যতার দুনিয়ার দরকার আছে, কিন্তু জেনারেল ডায়ারের যোগ্যতা না থাকলেও দুনিয়ার চল্‌তে পারে। গান্ধি, কামালের যোগ্যতা হাজার লোকের মঙ্গলে নিজেকে উৎসর্গ করেই সার্থক হয়, কিন্তু ডায়ারের যোগ্যতা হাজার লোকের মঙ্গল ব্যর্থ ক'রে দিয়েই বড় হয়। হাজার লোকের মঙ্গলই দুনিয়ার প্রকৃত মঙ্গল।

—তুমি কি মনে কর গান্ধি, কামালের মত লোক হাজার হাজার স্কুল কলেজ থেকে তৈয়ারী হবে?

—তা যদি না হয় হাজার হাজার ডায়ার তৈয়ারী করতে হবে তারই বা কি মানে আছে?

—আছে, নিশ্চয় আছে, যেহেতু কেবল মনুষ্যত্বের প্রেরণা দিয়েই দুনিয়ার শাসন ব্যাপার চল্‌তে পারে না, তার সঙ্গে যোগ্যতারও দরকার।

—যোগ্যতার দরকার কি আমি অস্বীকার করছি? মনুষ্যত্বের প্রেরণাই কেবল সুন্দররূপ শাসনের যোগ্যতা দিতে পারে। তা ছাড়া মানুষের দুঃখে যার সহানুভূতি নেই—মানুষের দুঃখ কষ্ট যে নিজে ভাগ ক'রে নিতে না জানে, মানুষের শাসন কর্ত্তা হওয়ার যোগ্য বা অধিকারী সে নয়।

—মনুষ্যত্বের প্রেরণা তোমার ভিতরেও আছে, তুমিও তা'হলে শাসনকর্ত্তার যোগ্য! তুমিও তা'হলে কামাল, মুসোলিনী বলে একজন?

—আমিই না হতে পারি, কিন্তু কামাল, মুসোলিনী বা জগলুল যে আর নেই এমনটী মনে ক'র না। The world knows

nothing of its greatest men. দুনিয়ায় তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

—দুনিয়ার শাসন ব্যাপারের জন্য দরকার তেমন লোকেরই যাকে দুনিয়া মানে ও চিনে।

—কামান, গুলি, গোলা, বন্দুকের সাহায্যে চেনান এক কথা আর স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা দিয়ে চেনান অন্য কথা।

—নিছক স্নেহ প্রীতি ভালবাসা দিয়েই শাসন ব্যাপার চলতে পারে না, সেই সঙ্গে Brute force (পশু বল) এরও দরকার। কামালের পিছনে যদি গুলি গোলা বন্দুক ও সৈন্যদল না থাকে তাকে তবে খুন করবার লোকেরও অভাব নেই।

সক্রেটিস যিশু মহম্মদ প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক উন্নতিকামী সংস্কারককে মূর্খ গোয়ার জন সাধারণের হাতে কি প্রাণান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তা কি তোমার জানা নেই?

—Brute force এর দরকার আমি অস্বীকার করছিনে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি মনুষ্যত্বের যোগ না থাকে তবে তা হয়ে পড়ে একদম বুনো, তা দিয়ে মানুষের শাসন চল্‌তে পারে না।

—না চলুক, কিন্তু স্কুল কলেজ সে জন্য দায়ী না। স্কুল কলেজ মানুষকে মানুষ হতে নিষেধ করে না। লাট সাহেব যদি তার মাহিনার সমস্তটাই দরিদ্রের সেবায় বিলিয়ে দেন তবে স্কুল কলেজ তার সেই কাজকে আদর্শ বলে মেনে নিতে রাজী আছে।

—শুধু আদর্শ বলে মেনে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়, আদর্শবান করে তোলাই আসল। কিন্তু সে আদর্শবান হয় ক'জনে? অবশ্য আমি বলছিনে যে সবাইকে তা করা যায়, কিন্তু অধিকাংশকে যদি তা

না করা যায় তবে সে কাজ ছেড়ে দেওয়া ভাল একদম অন্ধ প্রকৃতির হাতে।

—কিন্তু অন্ধ প্রকৃতির হাতে সমাজ ত অনেককাল ছিল, তখন কি সমাজে শৃঙ্খলা ছিল ?

—শৃঙ্খলা ছিল না, আবার বর্ত্তমানের শৃঙ্খলার নামে লুণ্ঠন বা Exploitation ও ছিল না। তখনও মানুষের স্বার্থ ছিল, স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ ও ছিল কিন্তু স্বার্থ তখন এমন সুশৃঙ্খল ভাবে ডাকাতি করতে শেখেনি। সহস্রকে এমন আইনের নাগ পাশে বেঁধে মুষ্টিমেয় ক'জন এমন যথেচ্ছা অপহরণ করতে শেখেনি। তখনও জোর যার মুল্লুক তার ছিল, কিন্তু এমন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে না—ব্যক্তিভাবে; এমন লুকিয়ে ষড়যন্ত্র ক'রে না, খোলাখুলি ভাবে। তখন নিছক গায়ের জোরই কাজ করত, এখন গায়ের জোরের সঙ্গে বুদ্ধির জোরও যোগ দিয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য সেই ঠিক একই আছে সেই to subjugate, to exploit, and to rob others but in a well planned organized manner under such polished name as civilization সভ্যতার নামে অপরকে অধীনতা পাশে বেঁধে সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ডাকাতি করা।

একটা উদাহরণ দিয়েই বুঝায়—ধর তোমার আদালত, তুমিই হাকিম; তোমার সাঙ্গ পাঙ্গ হ'ল—উকিল, মোক্তার, পুলিস দারোগা এই সব। পিছনে রয়েছে বিরাট রাজশক্তি—কামান, গুলি, গোলা বন্দুক ইত্যাদি। এই ডাকাতির কাজে রাজার সঙ্গে তোমাদের একটা বখরা আছে। তোমাদের অস্ত্র হ'ল কতকগুলি আইন যার মূল মন্ত্র খুব শান্তিতে সহজে ও কৌশলে লুট করা—যে লুন্ঠিত হয় সে আদৌও

জান্‌তে না পারে। ঘুঘু যেমন খাবারের লোভে বা খেলারছলে স্বেচ্ছায় ফাঁদে ধরা দেয় বা চমকপ্রদ আড়ম্বরপূর্ণ পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনের মোহে পড়ে যেমন করে রোগযন্ত্রণায় পীড়িত রোগী বার বার প্রতারিত হয়ে রোগের জটিলতা ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলে শেষে আত্মহত্যা করে তেমনি করে অজ্ঞ, মূঢ়, মূর্খ মানুষ বিবাদ করে বিচারে জয়ী হওয়ার আশায় তোমার আদালতের শক্তির আশ্রয় নেয়। তোমার আদালতের ধর্ম্মই প্রার্থীকে না ফেরান—এই কেবল মাত্র বিজ্ঞাপন খরচটা রেল ভাড়াটা আর লোক জনের মাহিনা বাবদ এই ধর উকিলের ৫০৲ টাকা, কোর্ট ফি ১০৲ টাকা আরদালি ৫৲ টাকা জমাদার দুটী·টাকা মোট ১০০৲ টাকা নিয়ে বিনা মূল্যে এই মহৌষধি বিতরণ করা।

দু পক্ষই যদি বেশ জরোয়ার হয় দিনের পর দিন পরিবর্ত্তন ও আপিলের পর আপিল চল্‌তে থাকে, শেষে তাদের সসীম শক্তি যখন ফুরিয়ে আসে অসাড় হয়ে ডানা মেলে দিয়ে এলিয়ে পড়ে। যেমন করে বাঁদরের পিটে ভাগে বিরক্ত হ'য়ে পরস্পর বিবাদা ও বিচারপ্রার্থী বিড়ালদ্বয় পিটে ফিরিয়ে নিয়ে বিচার প্রহসন হইতে রেহাই পেতে চেয়েছিল তেমনি করে মোকদ্দমা উঠিয়ে নিয়ে তারা পরিত্রাণ চায়; but then it is too late! তখন তারা দু পক্ষই সর্ব্বশান্ত ভিটের একখানা ঘরও নেই, অমন যে সমৃদ্ধিশালী পরিবার ও জমকালো দালান কোটা যাদুকরের মন্ত্র সঙ্কেতের ন্যায় কোথায় উধাও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

এমনি করে উজাড়. করাই তোমার আদালতের ধর্ম্ম। দেখ্‌ছ না? কেমন ডাঙ্গুস হচ্ছে তোমার রাজা আর তার মন্ত্রিবর্গ; আর

ঐ দেখ দেশের লোক জীর্ণ কঙ্কাল সদৃশ পড়ে রয়েছে তোমাদেরই রক্ত মোক্ষণের মহিমায়। মোকদ্দমা করে কেউ জিতেছে বল্‌তে পার? জিতেও যদি থাকে সেই নিজের প্রতিবেশী ভাইকে বলি দিয়ে তবে ত!

আমজাদ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া আকবর বলিয়া যাইতে লাগিল—পাড়াগাঁ যখন তোমার জন্ম স্থান তখন নিশ্চয় দেখে থাকবে কত পলাতক ভিটের করুণ হাহাকার দৃশ্য। কে কল্লে? ভেবে দেখেছ? বছর দুই আগে ওখানে যে বাস করত ক্রমাগত ক'বৎসর অজন্মায় জমীদারের খাজনা ও পাইক পেয়াদার হার ভিক্ষে, নজর, তামাদিসুদ্দ প্রভৃতি খাজনার দশগুণ উপরি না দিতে পারায় নালিশ রুজু হল। যথা সময়ে হাজিরের পরোয়ানা বার হ'ল। বেচারা উকিল ফি দিতে অক্ষম, তাই কাঁপতে কাঁপতে নিজেই হাকিমের সাম্‌নে গিয়ে হাজির। চসমার ভিতর হইতে রক্ত চক্ষু বের করে হাকিম জিজ্ঞেস করলেন—খাজ্‌না দাওনি কেন? সে কি বল্‌তে যাচ্ছিল, হাকিমের গরম মেজাজ দেখে আর বলা হ'ল না। নিলামের ডিক্রি দেওয়া হ'ল, তার পর ঐ দেখ—শ্মশানের মত শূন্য ভিটে খা খা করছে।

সত্যকার ব্যথার রাগে আকবরের মুখ মণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

আমজাদ মৃদু হাসিয়া কহিল তোমার কল্পনাটাই ত আর সত্যি হতে পারে না?

—সত্যি নয় কি বল্‌ছ? অমন ঢের হ'য়ে থাকে।

—কিন্তু উপায় কি?

—উপায়! তোমাদের ঐ আইন আদালত উঠিয়ে নাও, উপায় আপনি হবে।

—অরাজক অশান্তিকে ঠেকাবে কি দিয়ে ?

—অরাজক অশান্তিই ত দেশ এখন চায়, বহুদিন নির্ব্বিকার শান্তি ভোগ ক'রে ক'রে নানাবিধ মলিনতার চাপে দেশের আত্মা নির্জ্জিব জড়তাগ্রস্থ শুষ্ক মর মর হয়ে পড়েছে, একটা বিপ্লবের ঝড় এসে খানিক নাড়া দিয়ে যাক ; মানুষ চেতনা লাভ করে যে যার অধিকার বুঝে পড়ে নিক। ন্যায়ের নামে অন্যায়, সত্যের নামে অসত্য কুসংস্কার, অধিকারের নামে অনধিকার দেশ আর কতদিন সহ্য করবে ?

—চোর ডাকাতের শ্রীবৃদ্ধি হলেই বুঝি অন্যায় অসত্য দূর হয়ে যাবে ?

—নিশ্চয় যাবে, সত্যি করে চোর কে ? যে চুরি করে না যে চৌর্য্যবৃত্তিকে provoke (উদ্দীপ্ত) করে। কোন আদিম কাল থেকে সমাজ চোরকে শাসন করে আস্ছে, কৈ চোর ত গেল না! হয়ত কম হয়েছে কিন্তু পুলিশ পাহারা উঠিয়ে নাও আবার দ্বিগুণ বেড়ে যাবে ; রোগের মূল ধরে চিকিৎসা না করলে সুফল পাওয়া যায় না—ফলও স্থায়ী হয় না। দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ার ভোগের জন্য ; যে সেই সম্পদ মানুষের ভোগ্কে বঞ্চিত করে জমিয়ে রাখে সেই কি আসল চোর নয় ? সমাজ এই চোরকে পালন করে, আর যে এই চোরের বিরুদ্ধে সমাজের এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে জ্ঞানতঃ না হ'ক অন্ধপ্রকৃতির তাড়নায় হ'ক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় সমাজ তাকে চোর বলে জেলে দেয় ; অথচ চোর যে সে চোরই থেকে যায়। এইরূপে তলিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে চোর ডাকাত থেকে আরম্ভ করে বেশ্যা প্রভৃতি প্রত্যেকেই হয়ত সমাজের এক একটা বৃহৎ কুনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। বর্ত্তমান সমাজ তা'দিগকে নিন্দে করে কিন্তু ভবিষ্যত সমাজ এদের উপকারিতা স্বীকার করবে। বর্ত্তমানে এরা নিন্দনীয়, যেহেতু কোন আদর্শ মেনে চলে না

কিন্তু ভবিষ্যতে যখন এরা কোন আদর্শের অনুসরণ করবে, তখন এদের এই কাজকেই সুন্দর ও মহিমান্বিত দেখাবে।

আমজাদ ভাবিতেছিল—সে যদি বি, সি এস. পাশ করিয়া হাকিম হয় তবে আকবরের ঐ উক্তি তার সম্বন্ধেও খাটিবে। হয়ত কত জুলুমকারী দুর্ব্বৃত্ত মিথ্যা প্রমাণের উপর খাড়া করিয়া বিচারের জন্য অনেক মোকদ্দমা তাহারে নিকট আনিবে; সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হয়ত তাহাকে রায় দিতে হইবে। তাহাতে হয়ত অনেক নির্জ্জীব নির্দ্দোশ প্রাণী দুরন্ত শাসনের কবলে পড়িয়া নিদারুণ ভাবে নিষ্পেষিত হইয়া চিরতরে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু উপায় কি?

আমজাদ ভাবিতে চাহিল—সমাজ স্থিতির জন্য ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কোন ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে কিনা, কিন্তু ভাবিয়া বুঝিল কোন ব্যবস্থাই একেবারে নিখুঁত নির্দোশ হইতে পারে না! সকল ব্যবস্থারই অল্প বিস্তর অপব্যবহার আছে এবং তাহা অপরিহার্য্য। ব্যক্তি যদি কেবল সৎ উদ্দেশ্য লইয়া সৎ হইয়া চলে তবে তাহাই যথেষ্ট, আর যা কিছু স্রষ্টার হাতে ছাড়িয়া দিলেই যেন ভাল হয়। আকবরকে কিন্তু এসব কথা বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা, যে পাগল উদ্দেশ্য লইয়া যে পথ চলিতেছে তাহার পরিসমাপ্তি একমাত্র তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়; একমাত্র কঠোর প্রতিকূল অবস্থার হাতে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়াই সে বুঝিবে কত বড় একটা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য স্বপ্ন লইয়া সে পথ চলিতেছে।

বক্তৃতা শেষ করিয়াই আকবর আমজাদকে কহিল—কেমন, কথাগুলো মিথ্যে?

আমজাদ ভাব হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া কহিল—মিথ্যে কি

সত্যি তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না—সে যাক, তুমি এখন কি করবে মনে করছ ? এমন সময় বাবুর্চি আসিয়া কহিল—বাবু, রাত হো গিয়া বহুত, জলদি খানা খা লিজে। উভয়ে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল —১১টা বাজিতে যাইতেছে। তাহারা উঠিয়া খাইতে গেল।

(১১)

পরদিন প্রাতে আকবর একখানা মাসিকের পাতা উল্টাইতেছে, পিওন একখানা চিটি দিয়া গেল। চিটির উপর নিজের নাম দেখিয়াই সে চম্‌কিয়া উঠিল—হয়ত তার শ্বশুর বাড়ির। খুলিয়া দেখিল —সত্যই তাই, লেখিকা, তারই স্ত্রী জাহানারা। সে কৌতুহলের সহিত খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

পাক জনাবেষু—

আদাব হাজার হাজার বাদ আরজ আপনার স্নেহলিপি যথা সময়ে পাইয়াছি। আপনি যে আমাকে ভুলেন নাই ইহাই যথেষ্ট। লিখিয়াছেন আমার রূপ অর্থাৎ চেহারাটা আপনার তেমন পছন্দ হয় নাই কিন্তু আমার অন্তরের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া ভালবাসিয়া অন্তরে অন্তরে আমাকে অবজ্ঞা করিবার নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়া মাপ চাহিয়াছেন। আপনি কবে আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন বুঝিতে পারি নাই, আমার

অন্তরের সৌন্দর্য্যেরও কোন পরিচয় কখন আপনাকে দিয়াছি বলিয়াও আমার মনে পড়ে না; হয়ত আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছিলাম যে আপনার কথা আমার মনে পড়িবে, ইহাই যদি আমার অন্তরের পরিচয় হয়, আর এইটুকু পাইয়াই যদি আপনি আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন, তবে আমি খুবই কৃতার্থ। কেননা, উহা অপেক্ষা আমার আরও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। রূপ নয়, কোন প্রকারের শিক্ষা নয় কেবলমাত্র আমার অন্তরের জন্যই আমাকে ভালবাসিয়াছেন, ইহা কি আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা? কেন না, আমি যদি যথেষ্ট রূপের অধিকারীও হইতাম, খুব শিক্ষিতাও হইতাম তথাপি আমার আশঙ্কা থাকিত হয়ত আমা অপেক্ষা সুন্দরী ও শিক্ষিতা আরও অনেক আছে কিন্তু অন্তরের সম্পদে ত আমি কাহারও অপেক্ষা হীন ও দীন নহি। রূপ ও শিক্ষা অনেকটা ভাগ্যের হাতে কিন্তু অন্তর ত আমারই! আর সেটাকে যে সম্পূর্ণ করিয়াই আপনাকে দিতে পারিব সে বিশ্বাস আমার কাছে। সুতরাং আমি নির্ভয় নিশ্চিন্ত। যদি অবসর থাকে এখন একবার আসিবেন; সেবার লজ্জায় যাহা দিতে পারি নাই এবার আসিলে আমার ভিতর বাহির নিঃশেষে মুক্ত করিয়াই আপনাকে উপহার দিব।

আকবর চিঠিখানি লইয়া গিয়া আমজাদকে দেখাইল। আমজাদ পড়িয়া কহিল—এ তোমার স্ত্রীর লেখা?

—কি জানি, লেখা পড়া জান্‌লেও সে যে এমন লিখ্‌তে পারবে আমার বিশ্বাস হয় না;

—তবে?

—হয়ত কে লিখে দিয়েছে।

—সে যা'হক, ডেকেছে যখন তখন একবার দেখা দিয়ে এসো গে।

—দেখা দিয়ে বোধ হয় আর আসব না, বাড়ি বসেই সাহিত্য চর্চ্চা করব।

—বাড়ি বসে সাহিত্য চর্চ্চার কি সুবিধা হবে, reference প্রভৃতির দরকার হলে কোথায় পাবে?

তাছাড়া বাড়িতে অন্য অনেক অসুবিধাও হতে পারে।

আকবর ভাবিয়া দেখিল—মিছে নয়, বাড়িতে সাহিত্য চর্চ্চা উপলক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকিলে বাড়ির মুরুব্বিরাও বিরক্ত হইতে পারেন।

তাই সে শ্বশুরালয় হইতে শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিল।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলে যথা সময়ে বধু উপযুক্ত পোষাক ও গহনা পত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া পান দানিতে কয়েকটা পানের খিলি লইয়া দেখা করিতে আসিল। সেই প্রথমকার মত সে আজ তেমন কুণ্ঠিতা ও সঙ্কুচিতা নয়। কেমন সহজ অথচ সলাজ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নিকটে আসিয়া নত হইয়া পদস্পর্শ করিয়া প্রথমে আকবরকে একটা সেলাম দিল। আকবর তাহার মূল্যবান রেশমী কাপড়ে সজ্জিতা বধুকে একাকী ও স্বেচ্ছায় তাহার নিকট অগ্রসয় হইতে দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইবার তাহার স্পর্শে তাহার সারা অঙ্গে পুলকের বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিতে লাগিল। সে প্রেম বিহ্বল অবশ চিত্তে বধুর মুখখানি তুলিয়া ধরিতে তাহার আবরণ হীন মুখের প্রতি তাকাইয়া অবাক বিস্মিত হইল—দেখিল, সে মুখ শুধু সুন্দর ও সুশ্রী নয়, একটা শান্ত সুকুমার মাধুর্য্যের রসে

রসিয়া তাহা এমনি হইয়াছে যেন একখানি জীবন্ত কবিতা—শুধু ভাঁব আর ভাষা, যাহার কাছে তাহার আশৈশবের সমস্ত সাধনা, বিদ্যা ও বুদ্ধির গৌরব একেবারে তুচ্ছ ও নগণ্য। তবু সে উহাকে নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়াছে, উঃ কী মূর্খ সে! নিজের উপর তাহার একটা অমানুষিক ঘৃণা ও ধিক্কার আসিল। পদে পদে এমন ভুল! পরে ভাবিল এই মহামূল্য দানের যোগ্য কি সে? সে যে বহুপূর্ব্বেই দেশের জন্য দীন দুঃখীর সেবায় আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া ফকির সাজিয়াছে, তবে আবার একী প্রলোভন, খোদা?

বধূকে বুকে আকর্ষণ করিয়া প্রেম বিহ্বল স্বরে সে কহিল, আমায় মাপ করেছ জাহানারা?

—মাপ কি? আপনি ত কোন অপরাধ করেন নি!

—অপরাধ করিনি? তোমাকে অবজ্ঞা করার চেয়ে অপরাধ আর কি হতে পারে? তুমি ত শুধু সুন্দর নও! তুমি যে কি আমি বল্‌তে পারিনে। বলত তুমি কী?

প্রেম মুগ্ধ স্বরে বধূ কহিল—আমি আমি—আপনার দাসী।

আকবর বধূকে আরোও দৃঢ় ভাবে বুকে চাপিয়া তাহার সুকুমার মুখে একটা চুমা দিল। বধূ স্বামীর বুকে একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়া নিবিড় আরামে চুপ করিয়া রহিল, খানিক পরে আকবর কহিল—সেবার অমন ব্যবহার করলে কেন?

—কি?

—মুখ দেখালে না, কথাও কইলে না!

—আমার ভয় হ'ত পাছে আমার কথা বার্ত্তা বা চেহারা আপনার পছন্দ না হয়।

—এখন সে ভয় ভেঙ্গেছে ?

—হ্যাঁ

—কিসে ?

—আপনি ত আমার চেহারা বা কথা বার্ত্তায় ভাল মন্দ চান না ! আপনি চান—আমার ভালবাসা, আমার বিশ্বাস আমি তা দিতে পারব বেশী করেই।

—আমারও ঐ কথা, তুমি ভাল হও মন্দ হও তুমি আমারই, আমি যা কিছু হই না কেন চিরদিনই তোমাকে বুকে ক'রে রাখব।

বধূ তাহার কোমল দুখানি বাহু প্রসারণে স্বামীর বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া একান্ত নির্ভরতার ভাবে মুগ্ধাবেশে চুপ করিয়া রহিল।

আকবর কহিল—চিঠি লিখে দিয়েছিল কে ?

—আমাদের পাড়ার একজন মেয়ে—সম্পর্কে আমার ভাবী হয়।

—কার স্ত্রী ?

—কুদ্দুছ ভাইয়ের।

—তুমি লেখা পড়া কিছু জান না ?

—জানি সামান্য।

—পড় না !

— না।

—কেন ?

—ভাল লাগে না।

—কাঁথা সেলাই করতে ভাল লাগে ?

—লাগে।

—কেন ?

—জানিনে।

—মনে কর লেখা পড়া শেখাটাও কাথা সেলাইয়ের মত একটা কাজ। প্রথমে ভাল লাগবেনা কিন্তু পরে ভাল লাগবে। অনেক কিছুই প্রথমে ভাল লাগে না, পরে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাল লাগে।

বিশেষ এখন যখন তোমার বুদ্ধি হয়েছে ও ভাল মন্দ বুঝ্‌তে শিখেছ। হয়ত তোমার মনে হবে মেয়ে লোক আবার লেখা পড়া শিখে কি করবে, তুমি ত আর চাকুরি করতে যাবে না? চাকুরি না করতে হলেও লেখা পড়া শেখার দরকার। লেখা পড়া শিখে মানুষ শুধু টাকা উপায়ের জন্য না—চোখ কাণ ফোটাবার জন্য, মানুষ হওয়ার জন্য। হয়ত জিঙ্গেস করবে লেখা পড়া যে না শিখ্‌ছে সে কি আর মানুষ নয়? হ্যা, মানুষ, কিন্তু একটা খোকা মানুষে ও বড় মানুষে যে প্রভেদ লেখা পড়া জানা মানুষে ও না জানা মানুষে ঠিক সেই প্রভেদ। উড়তে পারা পাখীটার ও উড়তে না পারা পাখীটার যে প্রভেদ এতেও তাই। লেখা পড়া মানুষের চোখ কাণ ফুটায়—একগুণ মানুষ দশগুণ বড় করে দেয়।

যে মানুষ লেখা পড়া জানে না আশে পাশের ঐ ক্ষুদে পৃথিবীটার সঙ্গেই তার পরিচয়; নিজের দুখানি পা দিয়ে সে যতখানি বেড়িয়েছে সে ততখানি দেখেছে, যে কয়টা লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় সেই কয়টা লোককেই সে চিনে, তার বেশী নয়। কিন্তু যে মানুষ লেখা পড়া জানে তার কাছে সারা পৃথিবীটা দর্পণের মত চোখের আগায়। দশ হাজার বৎসরের আগেকার পৃথিবীও যে চিনে, দশ হাজার মাইল দূরের পৃথিবীও তার কাছে অজ্ঞাত নয়; তার বন্ধুর অভাব হয় না, উপদেশের অভাব হয় না। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণিদের

সঙ্গেও তার পরিচয় আছে। বলত এত বড় সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করতে আছে ?

—পড়্‌বে ?

—পড়্‌ব।

—কার কাছে ?

—কুদ্দুছ ভায়ের স্ত্রীর কাছে।

—আচ্ছা, কুদ্দূছ ভায়ের স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করবে ?

—কি জানি, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

—কি ক'রে ?

—তার বাড়িতে যাবেন বেড়াতে, ভাবী ব'লে ডাক্‌বেন, যদি কথা লে আলাপ করবেন।

—কুদ্দুছ ভাই আপত্তি করবে না ?

—দলহিজ থেকে কুদ্দুছ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

—তাই !

আকবরকে দেখিয়াই কুদ্দুছ মিঞা বলিয়া উঠিল—কেমন আছ, আকবর মিঞা, ভালত! কবে এলে?

—এই কাল এসেছি।

—বাড়ির সব ভাল?

—আমি কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছি

—আজকাল যুদ্দুর খবর কি?

—কৈ, আজকাল ত কোন যুদ্ধ হচ্ছে না!

—কেন, গান্ধির লড়াই?

—হাঁ, তা চল্‌ছে।

—জিতছে কে?

—গান্ধি দলই জিত্‌ছে।

—আপনি ত গান্ধির দলেই না?

—হ্যাঁ

—ইংরেজদের তাড়াতে পারবেন ত!

—ইংরেজদের তাড়াবার ইচ্ছে ত আমাদের নয়! ইংরেজ যেমন এখন আমাদের মনিব ও আমরা তাহাদের প্রজা বা গোলাম, আমরা চাই সে জায়গায় ইংরেজ ও আমরা সমান হয়ে এদেশে বাস করি। এখন যেমন দেশের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা ও তার অমাত্যবর্গ বিলেত

থেকে বহাল হয়ে আসেন, আমরা চাই সে যায়গায় আমাদের ভিতর থেকে যোগ্য ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে বা দরকার হলে তাকে বদলে তার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়ে আমাদের নিজের ইচ্ছে মত প্রথায় আমরাই দেশ শাসন করি।

কুদ্দূছ মিঞা হয় ত বুঝিল না বা বুঝিবার প্রয়োজনই বোধ করিল না! তাহার মনের ভিতর তখন অন্য একটা বিষয়ের খেয়াল খেলা করিতেছিল। সে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া কহিল—আমাদের হানিফি মোজহাবের একজন জবরদস্ত আলেম আজ যার সঙ্গে লা'মজহাবি মৌলভীদের বাহাছ হচ্ছে, শুনতে যাবেন না?

—বাহাছ হচ্ছে? কোথায়?

—এই খানিক দূরে, ফতেপুর বলে জায়গা।

—আপনারা যাবেন নাকি!

—যেতে হবে বৈকি! আমাদের পীর সাহেবও আসবেন কিনা—তাকে আনতে হবে, নেমতন্ন করে।

আকবরের কৌতুহল হইল; এই বাহাছের নাম সে অনেক পূর্ব্বেই শুনিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া বাহাছ হয় তা সে কোন দিন দেখে নাই। সে কহিল—যেতে ত পারলে হয়; কিন্তু ভাবীর সঙ্গে একবার দেখা করবার দরকার।

—কোন ভাবী?

—এই বাড়ির ভাবী

—কেন, কি দরকার?

—দরকার এই যে আপনাদের ভগ্নীকে একটু লেখা পড়া শেখাতে হবে—তাকে বলে ঠিক করে যেতাম।

—তা সে এসে করা যাবে। যেতে চান ত এখনই চলুন।

আকবর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল।

যথা সময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল দুপক্ষে বহুলোক সমবেত হইয়াছে। কয়েক গাড়ী ইট ও লাঠি দেখিয়া আকবর জিজ্ঞাসা করিল—এ গুলো কেন?

—ও তুমি জান না? বাহাছ করতে করতে যে মারামারিও হয়; সেবার মুন্সিগঞ্জের হাটখোলায় যা পেটাপিটি হয়েছিল তবে কেউ বাড়ি থেকে তৈয়েরী হয়ে আসেনি তাই, তা না হলে মোহাম্মদী বেটাদের দেখিয়ে দিত আমাদের এই হানাফির দল।

আকবর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া কহিল—কিন্তু আমরা ত কোন লাঠি সোটা আনিনি!

—তাতে হয়েছে কি, তুমি ভেব না, মারামারি আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা ছুট দেব।

আকবর ভাবিল—আচ্ছা, দেখা যা'ক খানিক কি হয়। ওপক্ষের মৌলভী সাহেবের বাড়ি কোথায়?

—ওর বাড়ি হাতি খোলায়—বেটা যা তা বদ্‌মায়েস! হেরে গিয়ে কিছুতেই স্বীকার করবে না যে হেরেছে—দলিল দস্তবিৎ দেখাতে পারবে না অথচ তর্ক করবে এমনিই! ও বলে কি আমাদের হানিফি পয়গম্বর নাকি ছিল না! আরে পাগল! হানিফি পয়গম্বর যদি নাই থাক্‌বে এত সব কেতাব লিখে গেছে তবে কে!—হানিফার লড়াই, জয়গুণ বিবির কেচ্ছা, এ সব?—কেতাবের কথা কখন মিথ্যে হয়, হ্যা?

আকবর এই সব সুযুক্তিপূর্ণ সুসম্বন্ধ কথার উত্তরে সমর্থন ছাড়া কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। সে কহিল—তাই কি আর মিথ্যে হ'তে পারে ?

এমন সময় গাড়ী ভর্ত্তি হইয়া কেতাব আসিল—। কুদ্দুছ একটু হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া কহিল—দেখ, কেতাবের ঠেলা ! দাঁড়াও মৌলভী, আজ তোমাকে নিকেস ক'রে তবে ছাড়বে ! এ বাবা আর কেউ নয়, দাদা পীর !

—ও পক্ষের মৌলভী সাহেবের নাম কি ?

—কি ভাল,—কবিরদ্দি না কি ! আগে ও জারি গানের খুঞ্জরী বাজিয়ে বেড়াত—ভারী গলার আওয়াজ কিন্তু ও বেটার ! উনি আবার মৌলানা সাহেবের সঙ্গে বাহাছ করবেন। আস্পর্দ্ধা দেখ !

—আপনাদের মৌলানা সাহেবের নাম কি ?

সে এক পাতা জোড়া, দেখেন নি, ছাপান আছে, ইস্তাহার কাগজে।

—কৈ দেখিনি ত !

—কুদ্দুছ জামার পকেটে কৌটার ভিতর হইতে সযত্নে রক্ষিত বহুকালের পুরাতন ইস্তাহার খানি বাহির করিয়া আকবরের হাতে দিল।

—আকবর একটু দেখিয়াই কহিল—হ্যাঁ, বেশ নাম।

—আমাদের মৌলানা সাহেবের প্রধান খলিফা যিনি তিনি এই দেশী লোক—বাড়ী বিক্রমপুর—তিনিও আজকাল পীরের দরওজা পেয়েছেন। আমরা তার হাতেই মুরীদ—তাকে দাওয়াৎ করব, যদি করেন তবে দেখ্‌বেন আমাদের বাড়িতেই আলাপ হবে কাল।

ঐ দেখ্‌ছেন—মৌলানা সাহেব আস্‌ছেন—আহা কি চেহারা ! বুড়ো

হয়েছেন তবু যেন পাকা গম! খোদার রওশনি থাক্‌লে অমনিই হয়— দাড়ী গুলোও দেখেছেন—খোদার রওশনি পেয়ে কেমন কটা লাল হয়েছে। আসল পীরের নিশানাই ঐ, না?

—হ্যা।

পীর সাহেব আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলে চারিদিক হইতে পাখার ব্যজন চলিতে লাগিল। পাখায় পাখায় ঠোকাঠুকিতে পীর সাহেবের পাগড়ীতে লাগিয়া নীচেয় পড়িয়া গিয়া ধুলা ও কাদা মাখিয়া গেল। পাগড়ীটা কয়েকজনে ধরিয়া তুলিয়া টেবিলে রাখিয়া দিলে পীর সাহেব মাথায় একটা চাদর জড়াইলেন। ইতিমধ্যেই পীর সাহেবের কদম বুছি লইয়া হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। দু'খানি মাত্র পা, টেবিলের নীচে ক'জনে তাতে আর চুমা দিয়া পারে? তাই পীর সাহেব পা দুখানি টেবিলের নীচে হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

এই সময় নিকটবর্ত্তী কোন স্কুলের একদল ছাত্র জনৈক শিক্ষক সমভিব্যাহারে বাগেরহাট দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে চাঁদা আদায়ের নিমিত্ত হার-মোনিয়াম যোগে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল। পীর সাহেবের নিকট কিছু পাইবার মানসে গান বন্ধ করিয়া পীর সাহেবের নিকট আসিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল। পীর সাহেব শুনিয়া ও সঙ্গে হারমোনিয়াম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—খোদা দিয়া ও লোককা মছিবত, তোমরা গাওনা গেয়ে আর ভিখ্‌ মেঙ্গে কি করবে?

ছাত্রেরা একযোগে বলিয়া উঠিল—আমরা তাদের সাহায্য করে বাঁচাব।

—তোমরা তাদের বাঁচাবে, তোমরা কি খোদা তায়ালা?

—তারা আর কিছু বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া মাষ্টার সাহেব হিলেন—হুজুর যদি দোষ না নেন একটা কথা বলি।

—কিয়া বলিয়ে! বহুৎ! বহুৎ!

—খোদা লোককে করেছে গোমরাহ্, আপনি হেদায়েত করতে সেছেন কেন?

—খোদাকা হুকুমছে।

—আর দুস্থ লোকের সাহায্য করা খোদার হুকুম না?

—কৈ, কোন কেতাবমে বোলা হ্যায় দেখলাইয়ে ত!

মাষ্টার সাহেব এবার উর্দ্দূতে আরম্ভ করিলেন—ছাদ্‌কা ফেতরা ত তব্ কিছিকা ওয়াস্তে?

পীর সাহেব হাসিয়া করিলেন—এতিম মোসাফির আর হেদায়েত রনে ওয়ালা আলেম কা ওয়াস্তে ছাদকা ফেত্‌রা দুরস্ত হালাল হায়।

মাষ্টার সাহেব মনে মনে বলিলেন—যেহেতু আপনিও একজন লেম। মুখে বলিলেন—তারাও গরীব এতিম হুজুর!

—কোন বোলা হায়?

—খবরমে বোল্‌তাহ।

—সব ঝুট বাত হায়—নাছারা বাঙ্গালীকা বাত কুছ ঠিক হোতা?

—বেঠিক লিখে তাদের কি লাভ, হুজুর?

—আরে যাইয়ে! যাইয়ে! খোদাকা উপর ইমান নেহি হায়, খালি লি বকনে আয়া। ইমান ঠিক করকে খোদা খোদা করনে বোল, লা মছিবত সব নিকাল যায়েগা।

মাষ্টার সাহেব মনে মনে বলিলেন—তাই বল যে দেবে না!

ছেলেদের বলিলেন—আয়রে আয়! পরে গান ধরিলেন, ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া চলিল—

"অনশনে আজ মরে যাহারা তারা যে মানুষ মোদের ভাই
তাদের দুঃখ তাদের ব্যথায় মোদের কি কিছু করিতে নাই?"

পীর সাহেব একটু রুক্ষ দৃষ্টিতে একবার তাদের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া কহিলেন—নাছারা কা এলেম শিখকে সব কাফের হো গিয়া, যানেকা বখত ছালাম আলেকম বি করনে নেই জান্‌তাহ্—ফির গাওনা করতা! নাউজু বিল্লাহে মিনহা! গলা উঁচু করিয়া কহিলেন—সে দোজখ যানে ওয়ালা কাহা হায়, আয়া?

—একজন কহিল—শুনলাম থানায় গিয়েছে।

—বাহাছ করেগা তব্ থানামে কাহেকো?

—ঐ আস্‌ছে হুজুর!

বিপক্ষের মৌলভী সাহেব আসিয়াই জনতাকে একটা ছালাম দিলেন পীর সাহেব একটু চিৎকার করিয়া কহিলেন—আরে মিঞা, জলদি কর কিয়া তোমারা ছোয়াল হায়, বোল!

—কবিরদ্দি সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—দাড়ী মোচ কোন পর্য্যন্ত রাখা ছুন্নত?

পীর সাহেব উত্তরে কহিলেন—চুল কাণ পর্য্যন্ত, দাড়ী আধ হাত এক মুষ্টি অর্থাৎ হজরত রসুলে করিমের যা ছিল।

—কবিরদ্দি সাহেব কহিলেন—কোন কেতাবমে হায়?

পীর সাহেব কেতাব আনিতে হুকুম দিলেন—জোব্‌দাতল ফোরছা।

—ও ছহি নেই হায়!

—কাহে?

—হাদিসছে বাতলাইয়ে ?

—আরে বেকুফ ! তুন্নত কা বাত কভু হাদিসমে রতা হায় ? এ ফেকা হায়—হজরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লা আন হুম এছমে ফরমাতাহু।

—ও নেহি মান্‌তা।

—কাহে নেই ?

ক্রমে ঝগড়া পাকিয়া উঠিল। পীর সাহেব রাগিয়া গিয়া সম্মুখের কেতাব ছুড়িয়া মারিলেন। কেতাব খানি কিন্তু একটু ভারি, তাই তাহা কবিরদ্দি পর্য্যন্ত না পৌছাইয়া দু' চার হাত দূরে গিয়া পড়িল। কবিরদ্দি সাহেব কি উদ্দেশ্যে তাহা কুড়াইয়া লইবার মতলবে যেমনি একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া নত হইবেন অমনি একযোগে পীর সাহেবের দলের দু' চার জন গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, ধস্তাধস্তি ঠেলাঠেলি চলিতে লাগিল ; শেষে কে একজন এক প্রবল ধাক্কা দিতে কবিরদ্দি সাহেব কেতাব ছাড়িয়া দিয়া চিত্‌ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পীর সাহেবের দলের সকলে তখন চিৎকার করিয়া উঠিল—জয়, হানিফি মোজহাবের জয় ! কবিরদ্দি সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধূলা ও কাদা ঝাড়িতে ঝাড়িতে স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া চিৎকার করিলেন—জয় লা' মোজহাবি জামাতের জয় ! তার দলের দু' একজন তাহা পুনরুচ্চারণ করিল কিন্তু তেমন জোরের সঙ্গে হইল না।

এমন সময় অদূরে দেখা গেল—দারোগা সাহেব কতকগুলি কনষ্টেবল লইয়া আসিতেছেন। পুলিশ দেখিয়া অনেকেই পলায়ন করিল। অবশিষ্ট রহিলেন পীর, কবিরদ্দি ও অল্প কয়েকজন চেলা চামুণ্ডা।

দারোগা আসিলে কবিরদ্দি সাহেব নিজেকে দেখাইয়া কহিলেন—এই দেখুন কেমন করে মেরেছে, হুজুর !

—মা'র খেয়ে আবার লা' মজাহাবির জয় চিৎকার করছিলেন কেন ?

কবিরদ্দি সাহেব আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—তা হুজুর বাহাছ হচ্ছিল কিনা তাই।

—বাহাছ হচ্ছিল কি মারামারি করে ?

—ওরা মারলে আর কি করব, হুজুর ?

—ওরা মারলে ! ওরা ত আমাকে মারতে যায় না ! এ সব গাড়ী বোঝাই ইট কার ?

—ও সব ও দলের হুজুর !

দারোগা সাহেব পীর সাহেবের দিকে চাহিলেন। পীর সাহেব কহিলেন - না হুজুর ও ওদের।

দারোগা সাহেব কহিলেন—ও যদি কারো না হয়, আমি তবে গাড়ী গরু থানায় নিয়ে যেতে পারি ?

পীর ও কবিরদ্দি সাহেব মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া কহিলেন—ও যাদের তারা পালিয়েছে, হুজুর !

—তারা আপনাদের লোক ত !

—উভয়েই চুপ !

—চলুন, আপনাদের থানায় যেতে হবে। শান্তি ভাঙ্গার মোকদ্দমা দেব, আমি যদি না আসতাম এই যে খুনোখুনি হ'ত এর জন্য দায়ী হ'ত কে ?

কবিরদ্দি ও পীর উভয়েই ভয় পাইয়া কহিলেন—অমন আর হবে না, হুজুর !

—হবে না তাতে বিশ্বাস কি ? চলুন, লিখে পড়ে দিয়ে আসবেন,—আর কখন বাহাছ করবেন না।

জেল খাটার চেয়ে তাহারা অগত্যা তাহাতেই রাজী হইলেন। পুলিশ দেখিয়া কুদ্দুছ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে আকবর বাধা দিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি দেখিতেছিল।

দারোগা সাহেব পীরদ্বয়কে থানায় লইবার উপক্রম করিলে আকবর অগ্রসর হইয়া কহিল—শুধু undertaking নিয়ে ছেড়ে দিলেই এর মূল যাবে না, এর মূলে রয়েছে লোকের অজ্ঞতা ও বাংলার মাদ্রাসা গুলো। আপনার গভর্ণমেণ্টকে বলে যদি ঐ গুলো উঠিয়ে দিতে পারেন তবেই এর প্রতিকার হবে, তা না হ'লে নয়। কিন্তু এর প্রতিকার হলে আপনাদেরও দরকার হবে না সেটুকুও মনে রাখবেন। এই প্রকার আকাস্মিক অপ্রত্যাশিত ব্যঙ্গোক্তিতে দারোগা সাহেব একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরিয়া কি বলিতে চাহিলে আকবর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিল। কুদ্দুছ কহিল—পীর সাহেবকে ত দাওয়াত করা হ'ল না।

—আজ পুলিশের হাতে ছাড়া পা'ক, পরে কাল দাওয়াত করবেন—বলিয়া আরও দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল।

কুদ্দুছ কহিল—জেলে দেবে না ত ?

—দিতে পারে !

—হ্যা পীর লোককে জেলে দেয় কার বাপের সাধ্য, ফু দিলে জেল জ্বলে যাবে না ?

—তা যেতে পারে !

—তবে ?

—সে কাল হ'বে, আজ আসুন, রাত হ'য়ে গেল।

বাড়ী পৌঁছিলে বিদায় নেওয়ার সময় আকবর কুদ্দুছকে কহিল—ভাবীর সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। কাল সকালেই আমি চলে যাচ্ছি, একটু বলে দেবেন আপনাদের ভগ্নীকে একটু যত্ন করে পড়ান।

কুদ্দুছ কহিল—আচ্ছা।

(১৩)

দাওয়াত করিতে হয় নাই। পরদিন প্রত্যূষে কয়েকজন তালেবে এলেম সঙ্গে লইয়া পীর সাহেব নিজেই আসিয়া মুরীদ বাড়ী আশ্রয় লইয়াছেন। সেদিন মৌলভী সাহেব মসজিদের যে কোনটীতে দাঁড়াইয়া আজান দিতেছিলেন সেখান হইতে মোল্লাদের পুকুরের দক্ষিণ দিকটার জলের কিনারাটা বেশ নজরে পড়ে। পূর্ণ বয়স্কা একটী যুবতী স্ত্রীলোক সেই কিনারায় দাঁড়াইয়া কাপড় কাচিতেছিল। বেলা তখন দুপুরের একটু অধিক। মৌলভী সাহেব "হায় আলাল ফালাহ" বলিতে বলিতে যখন দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইলেন যুবতীর দিকে তার নজর পড়িল। আজানান্তে তিনি লুব্ধ দৃষ্টে তাহার দিকেই চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। যুবতী কয়েকখানা কাপড় কাচা শেষ করিয়া ক্ষণিক বিশ্রামের নিমিত্ত যখন খাড়া হইয়া দাঁড়াইল মৌলভীর দিকে তার নজর পড়িল। তাকে অমন লুব্ধ দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিয়া ক্ষারসিক্ত কাপড়গুলি লইয়া পুকুরের অন্য পাড়ে সরিয়া গেল।

মৌলভী সাহেব ওরফে এ অঞ্চলের পীর সাহেব জোহরের ফরজ নামাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া একটা লোটা হাতে মসজিদের পিছনে জঙ্গলের ভিতর আস্তে আস্তে ঢুকিয়া পড়িলেন। যুবতী যেখানে দাঁড়াইয়া কাপড় কাচিতেছিল তাহার খুব সন্নিকটেই একটা ক্ষুদ্র ঝোপের আড়ালে বাহ্যে করিবার ছলে লুকাইয়া থাকিয়া যুবতীকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কতক গুলি অল্পবয়স্ক বালক সেখান দিয়া গরু লইয়া যাইতে মৌলভী সাহেবকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—ওরে দেখ! দেখ! মৌলভী কোথায় পায়খানা ফিরছে, ওযে জ্যান্ত কবরখানা!

মৌলভী সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া যেন তাহাদের কথা শুনিতে পান নাই এমনভাবে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—বেয়াদব পাঁজী—নচ্ছারের দল, এখানে কেন তোরা গরু নিয়ে এলি, আমি পায়খানা ফিরছি, দেখতে পাচ্ছিস না?

—আপনি কবরখানায় পায়খানা করছেন তা কে জানে?

—এখানে কবর আছে, পাজি নচ্ছার কোথাকার?

তাদের ভিতর হইতে একজন তেমনি জোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—না, নেইত কি, কবর কোথায় আছে না আছে আপনি জানেন?

এমন সময় তার সঙ্গীয় অপরাপর বালকগণ বলিয়া উঠিল—ওরে যা, তর্ক করিস নে! মৌলভী মানুষ, বদ দোওয়া করলে দেখে নিও এখন।

সে তখন চুপ করিয়া গেল। মৌলভী সাহেব অতঃপর তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদের ভিতর হইতে শান্ত শিষ্ট পানা একজনকে ধরিয়া লইয়া চুপি চুপি কি বলিয়া দিলেন। সে এক দৌড়ে পুকুরের পাড় হইতে ঘুরিয়া আসিয়া মৌলভী সাহেবের নিকট গিয়া কহিল—

কুদ্দুছ কাজীর বউ। মৌলভী সাহেব পকেটে হাত দিয়া পুনরায় বাহির করিয়া আনিয়া কহিলেন—পয়সা ত নেই খোকা, আর একদিন দেব, হ্যা? সে মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিয়া যতখানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দৌড়িয়া গিয়াছিল ততখানি দুঃখে মুখখানি মলিন করিয়া গরুর পশ্চাৎ ফিরিয়া গেল।

(১৪)

রাত প্রায় ৮টার সময় কুদ্দুছ মিঞা সাজিয়া গুজিয়া কোথায় বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া তার স্ত্রী আমিনা আসিয়া তিরস্কারের সুরে কহিল—হ্যাগো, তুমি যে অমনটা মৌলভীর পিছে পিছে সারাদিন ছোয়াব কুড়িয়ে বেড়াও, তোমার সংসার দেখে কে? আমি একা আর কত ক'রে পারি? মাঠের ভূই গুলোও ত আমি আর চষে দিয়ে আস্‌তে পারিনে! গরু দু'টোর হাল দেখ দেখি কেমন হ'য়েছে! দু'ধের বাছা ছেলেকে দুধ কিনে খাওয়াব বলে মুর্গী বেচে তিনটে টাকা করেছিলাম, তুমি তা নিয়ে গিয়ে কোন মৌলভী কি পীরের দপ্তরে দিয়ে এলে। আমার কথা আমি কিছু ভাবিনে কিন্তু এমন ক'রে গাফিলি ক'রে দেনায় পড়ে গেলে তোমায় ঠেকাবে কে?

কুদ্দুছ খানিক উত্তেজিত হইয়া কহিল—আরে, এ মাগী বলে কি? পীর সাহেব ওরসে দাওয়াত করেছিল, টাকা তিনটে দিয়ে এসেছি, অন্যায় হয়েছে? ধর্ম্মের জন্য টাকা খরচ করলে কি অন্যায় করা হয়? তোর জন্যে দেখছি আমায় জ্যান্ত দোজখে পুড়ে মরতে হবে। হায়

খোদা! আগে যদি জানতাম এমন, তাহ'লে কি এই মেয়ে মানুষের বালাই আমি ঘাড়ে করি?

'তোমার যা মন চায় করগে আমি আর কিছু বলছি নে' বলিয়া রাগ ভরে আমিনা রান্না বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

মোল্লাদের বৈঠক ঘরে ওয়াজের মজলিস্। মজলিসের এক পার্শ্ব মৌলভী সাহেবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার চারি পাশে তাকিয়া বা বালিশ সাজান; সামনের পানদানীতে কয়েকটা পানের খিলি; একটী গোলাপ পাশ ও কয়েকটা ফুলের তোড়া; উপরে ঝাড় বাতি জ্বলিতেছে। মসলিসে লোক সমাগম মন্দ হয় নাই। মৌলভী সাহেব একযোগে দুইটা পানের খিলি মুখে পুরিয়া দিয়া সকলকে দরুদ পড়িতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পান দুইটা চিবাইয়া লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া "আযুজ' বিল্লাহ" হলকম হইতে বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে যাইয়া পান মুখে কথায় সুবিধা হইল না দেখিয়া পান ফেলিয়া দিয়া উচ্চারণ করিয়া শুনাইলেন। পরে এক প্রকার সুরের সঙ্গে আরম্ভ করিলেন—হাজেরাণ বেরাদারাণ—আজ আপনারা যে এই ওয়াজের মজলিসে হাজির হয়েছেন এতে আল্লাহ পাক আপনাদের উপর খুব খুশী হয়েছেন ও ফেরাস্তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে হে ফেরেস্তাগণ ঐ দেখ আমার আদম জাতেরা কেমন করে আমার নাম করছে, তোমরাও যাও আমার নাম করগে, আর দেখে এসগে কোন কোন বান্দা হাজির হয়েছেন। যারা ওয়াজের মজলিসে হাজির হয়েছেন তাহাদের জন্য আমি বেহেস্তের দরওয়াজা খুলে রাখলাম। কিন্তু ভাই সকল, একটা কথা মনে রাখবেন—'শুধু ওয়াজ শুনলেই বেহেস্ত যেতে পারবেন না, যতক্ষণ না ওয়াজের মতলব মত কাজ করছেন অর্থাৎ মুরীদ হচ্ছেন। তারপর হজরতের দান্দান সহীদ হওয়ার বয়ান

আরম্ভ করিলেন। কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে হজরতের দাঁত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কতখানি রক্ত পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া বনের পশু পাখী কেমন করিয়া কাঁদিয়াছিল, কার কার কলিজা টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল, আন্দাজে কে কার কতগুলি দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল উচ্ছ্বাসের সহিত বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন ও একবার কাঁদিয়া ফেলিলেন আর বলিলেন—হজরতের জন্য যে এক ফোটা চোখের পানী ফেলিবে সে বিনা কৈফিয়তে বেশখ বেহেস্তে যাইবে। বলিতেই অনেকে জোর করিয়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল। তারপর মোহাম্মদী মৌলভীদের ধোকার বয়ান আরম্ভ করিলেন—কেমন করিয়া তাহারা লোককে ধোকা দিয়া জাহান্নামের পথে লইয়া যাইতেছে, কেমন করিয়া লোক তাহাদের কথায় মজিয়া ইহকাল পরকাল হারাইতে বসিয়াছে বর্ণনা করিয়া তাহাদের কে কবে কার কাছে মা'র খাইয়াছিল, তাহার সঙ্গে ওয়াজে হারিয়া আসিয়াছিল বলিয়া লোকদের মুরীদ হওয়া সম্বন্ধে উদাসীনতার কথা বলা শেষ করিয়া ওয়াজ সমাধা করিবেন, এমন সময় পর্দ্দার আড়ালে কার কোলের খোকা কাঁদিয়া উঠীল। হঠাৎ মেয়েদের কথা মৌলভী সাহেবের মনে পড়িয়া গেল। হায়েজেয় সময় ছহবৎ যে একদম হারাম তা পুরুষদের ভালমত শুনাইয়া দিয়া মেয়েদের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—মেয়েরা আর পূর্ব্বের মত স্বামীর খেদমত করে না, আর পর্দ্দা মানে না। প্রায় খড়ি কুড়োতে মাঠে যায়, কাপড় কাচতে পুকুরে যায়—এ সব একদম বেদাতি, পরকালে পুরুষদেরও এর জন্য দায়ী হতে হবে। যার স্ত্রীকে কোন পরপুরুষ কখন দেখতে পেয়েছে পরকালে দোজখের আগুনে তার কঠিন সাজা হবে। এ সব বেদাতির একমাত্র কারণ—মুরীদ না হওয়া। তারপর কেমন লোকের কাছে মুরীদ হওয়া দরকার—পীরের নেশানা কি

কি তাহা হাদিস হইতে বয়ান করিয়া বুঝাইলেন ও সে সব নেশানার সঙ্গে যে মৌলভী সাহেবের যথেষ্ট মিল আছে তাহাও প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিলেন। হাজেরাণ মজলিসকে অতঃপর দরুদ পড়িতে বলিয়া এক খিলি পান মুখে দিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

কুদ্দুছ কাজী ওরফে কুদ্দুছ মিঞাও শুনিতেছিল, আর ভাবিতেছিল তার স্ত্রীও অনেক সময় বাহিয়ে গিয়াছে, আর পরপুরুষেও দেখিতে পাইয়াছে—তবে তাহার উপায় হইবে কি? না, মুরীদ না হইলে আর চলিতেছে না; ধার কর্জ্জ অথবা যাহা করিয়াই হউক মুরীদ তাহাকে হইতেই হইবে। ওয়াজ সমাধা করিয়া মৌলভী সাহেব মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলেন। মৌলভী সাহেব চলিয়া গেলে সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—পীর সাহেবের বড় ভাল বোজরগী ও ফকিরি হাছেল আছে, নইলে আমাদের মেয়েরা যে বাইরে যায়, তা তিনি জানলেন কি ক'রে? ছমির সর্দ্দারের গরু মারা গেছে জবাই করা হয়নি তাই বা জানল কি করে? না, টাকার মায়া করলে আর চলে না, দুনিয়া আর ক'দিন।

মৌলভী সাহেব মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিলে কুদ্দুছ তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মৌলভী সাহেব কহিলেন—আরে, আর কাঁদলে কি হবে, তোমার স্ত্রীকে পুকুরে কাপড় কাচতে পাঠাও কেন? মৌলভী সাহেবের কেরামতির গুণ এবার আরও নিশ্চিত হইয়া ভয়ে তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—পীর সাহেব, এবার আমায় মাপ করুন, অমন কাজ আর কখন হবে না।

—মাপ আমি করব কি, খোদা করবে; কিন্তু খোদার কাছ থেকে মাপ চেয়ে দেওয়া কি সোজা কথা, সে জন্য অনেক খাটতে হয় কিন্তু মুরীদ না হলে ত আমি পারব না!

—হুজুর, সেই কথাই ত আমি বল্‌ছি !

—মুরীদ ত শুধু তোমায় হলে চলবে না, তোমার স্ত্রীকেও হতে হবে।

—আমিও সেই কথাই বল্‌ছি।

—বেশ, তবে দাওয়াত করছ কবে ?

—কুদ্দুছ মিঞা একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিল—কালই হুজুর।

—বেশ তাই, ভালমত খাওয়ার জোগাড় ক'র, আমি কি খাই জান ত ?

—"জি হ্যা হুজুর" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল—হুজুর আমার একটা ছেলে আছে, তাকেও কি মুরীদ হতে হবে ?

—বয়স কত ?

—এই বছর দুই

—হ্যা, তা করা যেতে পারে, ছেলেদের গোণার জন্য মা বাপই দায়ী হয় কি না।

কুদ্দুছের আগে জানা ছিল—ছেলেদের নাকি গোণা হয় না। তাই সে জিজ্ঞাসু হইয়া কহিল—ছেলেদের নাকি গোণা হয় না হুজুর।

—গোণা হবে না কেন। তবে সেজন্য তারা দায়ী হয় না—তাদের মা বাপই দায়ী হয়।

—কুদ্দুছ বুঝিয়া কহিল—আচ্ছা হুজুর।

সে দিন পুকুরের সেই ঘটনায় মৌলভীর সচ্চরিত্রতায় আমিনার একটু সন্দেহ লইয়াছিল, সে কিন্তু তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। করে নাই এইজন্য যে তাহার নামের সহিত যুক্ত হইয়া কোন একটা বিষয় গ্রামময় সকলের দ্বারা আলোচিত হওয়া সে পছন্দ করিত

না ; অধিকন্তু একটা লোকের নামে সত্য হউক বা মিথ্যা হউক কোন অপবাদ রটানোও তাহার রুচি বিরুদ্ধ ছিল।

রাত প্রায় আটটায় কাজী পাড়ার প্রায় সকল মহিলাই কুদ্দুছের গৃহ প্রাঙ্গণে মৌলভী সাহেবকে ঘিরিয়া বসিয়া গিয়াছে। কুদ্দুছ পত্নীর প্রতীক্ষায় এখনও একটাকেও মুরীদ করা হয় নাই। আমিনাকে দু'এক বার ডাকা হইয়াছে, সে এ কাজ ও কাজের দোহাই দিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত কাটাইয়া দিয়াছে। এইবারে ঘুমন্ত ছেলেকে দুধ খাওয়াইবার অছিলায় বসিয়া গেল। কুদ্দুছ নিজে আসিয়া জোর গলায় হাকিয়া বলিতে লাগিল—কই, রান্না ঘরের ভিতর কি হচ্ছে, বারে বারে ডাকা হচ্ছে, তোমার হয়েছে কি শুনি ?

—হবে আবার কি ? আমি ত কালই বলিছি ও মৌলভীর কাছে আর মুরীদ হব না ; মুরীদ আগে আমি হয়ে পড়েছি।

— মুরীদ একবার হলেই হ'ল, তারপর আর তুমি গোণা করনি ?

—"না"

—না, বল্লেই হ ল, না ?

—আচ্ছা করিছি করিছি, আমার গোণার জন্য আমি দায়ী হব, তোমাকে হতে হবে না।

কথাগুলি কুদ্দুছের কাণে ভাল শুনাইল না, সে এক লাফে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাহার চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া তুলিল। পরে উঠান দিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে মৌলভী সাহেবের সামনে আনিয়া দাঁড় করাইল।

মৌলভী সাহেব কহিলেন—হ্যা গো বাছা, অমন লজ্জা করছ কেন ? পীর মোরশেদের সাম্‌নে কি লজ্জা করতে আছে ? দেখ

দেখি এত সব মেয়েরা না ডাকৃতেই এসে হাজের হয়েছে। আমেনাকে শেষে বাধ্য হইয়া মৌলভী সাহেবের সামনে পিঁড়ার উপর বসিতে হইল।

মৌলভী সাহেব কহিলেন—ঘোমটা খুলে ফেল, মুখ না দেখ্‌লে মুরিদ করা যায় ?

কুদ্দুছ উঠানে দাঁড়াইয়াছিল; সে কহিল—আপনিই খুলে নেন হুজুর, ওকি আর নিজে খুল্‌বে ?

—না সেটা ঠিক হয় না, বলিয়া পাশের এক যুবতীকে হুকুম করিতে সে খুলিয়া দিল। সকলেই দেখিল—আমেনার সুনিটোল সুশ্যামল মুখখানি ক্ষোভ ও লজ্জার রক্তিম আভায় তরুণ অরুণের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সুকোমল ফুল্ল দুটী গণ্ড বহিয়া দু ফোটা অশ্রু মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। কেমন মধুর মোহন করুণ সেই মূর্ত্তি! যেন কোন ব্যথায় রাগিণী ব্যাধের কঁবলে পাড়য়া উপায়হীন স্থির নীরব নিশ্চল কাতরতায় মূর্চ্ছার প্রতীক্ষায় স্পন্দিত হইতেছে।

মৌলভী সাহেবের কলেমা খাণিকক্ষণ পর্য্যন্ত আওড়াইয়া সেদিনের জন্য তাহার ছুটি হইল।

কুদ্দুছ পাড়ার কোন মহাজনের নিকট হইতে ষোলটী টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মৌলভী সাহেবকে বিদায় করিয়া দিল। আপাততঃ দোজখের মহাবিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিশ্চিন্ত হইয়া সংসারের কাজে মন দিতে পারিল; প্রথমে গরু দুটোর দিকে তাহার নজর পড়িল। সেদুটি শুকাইয়া হাড় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বিচালি কাটিয়া

তাহাদের পাঁচ দিনের খোরাক একদিনে খাওয়াইল। তাহাদের ভিতর যেটী একটু অধিক বয়স্ক সে কিন্তু হজম করিয়া উঠিতে পারিল না। পেট ফাঁপিয়া শরীর অপেক্ষা পেটের আয়তন বৃদ্ধি পাইল। কুদ্দুছ মৌলভী সাহেবের নিকট হইতে পানি পড়া আনিয়া খাওয়াইয়া দিলেও কোন ফল হইল না দেখিয়া হয়াত (পরমায়ু) না থাকিলে বাঁচে না ভাবিয়া মৌলভী সাহেবের বিধান মতে জবাই করিয়া দিল।

গরুটীর রোগের বিবরণ আমেনাকে এ কয়দিন কিছুই বলা হয় নাই। হঠাৎ জবাই করার কথা শুনিতে পাইয়া সে অতি মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বলিয়া ফেলিল—কোথাকার ও ভাতমারা ছ্যাচড়া মৌলভী এয়েছে এ গ্রামে মরতে? বাড়ি বাড়ি খাচ্ছে আর ফতোয়া দিয়ে দিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছে। খেটে যদি খেতে হয় ত ওর অত কথা মনে থাকে না' বলিতে বলিতে সহসা কুদ্দুছের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। কুদ্দুছ মিঞা মহারোষে মুখ চোখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল—ও'ক কথা বল্লি তুই পীর সাহেবকে? চারিদিক থেকে বেয়ে ছেয়ে পাপের বোঝা খোয়াচ্ছি ও আবার তাই পূরণ করছে! দাঁড়া, পীর সাহেবকে ব'লে আজই তোকে তালাক দিয়ে তবে আমার আর কাজ! তালাক দেওয়ার কথায় আমেনা একটু ক্ষুব্ধ বিচলিত হইয়া কহিল—ও ছাড়া কি তোমার আর কোন গাল নেই?

—থাকাচ্ছি তুই দাঁড়া, এ ভিটের ভাত তোর বরাতে নেই আদৌও তা আমি অনেক দিন আগে টের পেয়েছি, বলিতে বলিতে বাড়ির বাহির হইয়া গিয়া ভাবিল—পীর সাহেব নিশ্চয় একথা জানিতে

পারিয়াছেন, পীর লোকের কাছে কি কিছু অজানা থাকে ? ভাবিয়াই তাড়াতাড়ি পীর সাহেবের নিকট গিয়া কাতর হইয়া দাঁড়াইল। পীর সাহেব কহিলেন—খবর কি কুদ্দুছ ?

—খবর আর কি বল্‌ব হুজুর, আপনি ত সব জানেন! আমার স্ত্রী বড় বেয়াড়া হ'য়ে পড়েছে, তাকে তালাক দেব ?

—সে কথা আমি সেইদিনই তোমাকে বল্‌তে চেয়েছিলাম, তা তুমি রাজী হও কিনা!

—আপনারা এক কথা বল্‌লে কি অস্বীকার কর্‌তে পারি ? পীর লোকের কথা কি কখন ফেলা যায় ?

—তা ঠিক, তবে তালাক দেবে এখন ? কুদ্দুছ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—তা হুজুর আপনি যদি বলেন!

—আমি যাই বলি, তোমার কি ইচ্ছা ?

তালাক বলিতে কি বুঝায় তাহা কুদ্দুছ মিঞা জানিত কিন্তু তালাক দিতে কি বুঝায় তাহা সে কখন ভাবিয়া দেখে নাই। সে খেয়ালের মাথায় দৌড়াইয়া আসিয়াছিল তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, তালাকের নামে পীর সাহেবকে খুশী করাই ছিল তাহার মতলব। সে আশা করিয়া আসিয়াছিল পীর সাহেব হয়ত তাহাকে বুঝাইয়া ক্ষমা করিতে বলিবেন ও ভবিষ্যতের জন্য শাসনের ব্যবস্থা বলিয়া দিবেন।

সে পুনরায় কহিল—তা হুজুর আপনি যা বলেন!

—আমার কথা যদি নাও তবে ও বউ তালাক দেওয়াই তোমার উচিৎ, ওকে নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারবে না। অবাধ্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়াই কোরাণের হুকুম।

কথাগুলো নির্ম্মম শেলের মত তাহার বুকে গিয়া বিঁধিল। তবে কি সত্যই তাহাকে তালাক দিতে হইবে? আর কোন ব্যবস্থা কি নাই? তাহার ইচ্ছা হইতেছিল পীর সাহেবকে বুঝাইয়া বলে তাহার নিজের সঙ্গে সে যত বড় দুর্ব্যবহারই করুক না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পীর সাহেবকে গালি দেওয়াই হইয়াছে তাহার অপরাধ; পীর সাহেব কি সেজন্য তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন না? কিন্তু বলিতে সাহস পাইতেছিল না, সে কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়া কাতর হইতেছে দেখিয়া পীর সাহেব কহিলেন—যাও, দোয়াত কলম নিয়ে এসগে' আমি তালাক লিখে দিচ্ছি। তোমার শুধু একটা টিপ সই দিলেই চল্‌বে। কুদ্দুছ দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বিধা সঙ্কুচিত মনে মরার মত পদক্ষেপে অগ্রসর হইল।

মৌলভী সাহেবের দৃষ্টির আড়াল হইয়া গিয়া ইতস্ততঃ পায়চারি করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল—

এড়াইবার কি কোন পথ নাই? পীর সাহেবকে মান্য করা হয় অথচ—! অনেকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। এদিকে কালবিলম্ব হইতেছে, পীর সাহেব হয়ত রাগিয়া যাইবেন। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রতিবেশী ভাই হারাণের নিকট গিয়া দোয়াত চাহিল।

হারাণ জিজ্ঞাসা করিল—দোয়াত কি করবি রে কুদ্দুছ?

—দরকার আছে, মৌলভী সাহেব চাইছেন।

হারাণ ভাবিল হয়ত কাহারও অসুখের জন্য তাবিজ টাবিজ লিখিবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—কার অসুখ রে?

কুদ্দুছ কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া দোয়াত লইয়া প্রস্থান করিল।

ফিরিয়া আসিয়া মৌলভী সাহেবের সম্মুখে দোয়াতটা রাখিয়া দিয়া মরার মত নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল।

মৌলভী সাহেব লিখিতে লাগিলেন—

যেহেতু আমার স্ত্রী—

* * *

কুদ্দুছ ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে লেখা দেখিতেছিল। লেখার প্রত্যেক অক্ষরটী যেন তীব্র বিষাক্ত চাহনিতে তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ করিতেছিল! ভবিষ্যতের কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার সারা প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তবু সে কিছু বলিতে পারিল না। সমস্ত শুভাশুভ ভাগ্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া স্থির অপলক দৃষ্টিতে কেবল নির্ব্বোধের মত তাকাইয়া রহিল।

লেখা শেষ করিয়া মৌলভী সাহেব তাহার হাতের টিপ লইয়া লেখাটী তাহার হাতে দিলেন। কম্পিত হস্তে সে তাহা গ্রহণ করিতে তাহার সমস্ত শরীর দুলিতে লাগিল—যেন মৃত্যুদণ্ড—যেন কালসাপ, এখনি দংশন করিবে আর সে দংশন বিষে সারা জীবন তাহাকে ছট্‌ফট্ করিতে হইবে।

উদ্বেগ-অবসন্ন হৃদয়ে তালাক নামা লইয়া গিয়া দেখিল—আমিনা তখন উঠানে ঝাঁট দিতেছে,—তাহারই সংসারের কাজে ব্যস্ত। সে ভাবিতে বসিল—এ কেমন করিয়া সে তাহার হাতে দিবে? যে নাকি সারাদিন নিজের সকল আরাম আয়াস তুচ্ছ করিয়া তাহারই সেবায় রত, তাহারই কাজে লিপ্ত ও নিবেদিত প্রাণ, তাহারই সংসারের মঙ্গল সাধনে তৎপর, যাহার নিজের বলিতে স্বতন্ত্রভাবে কিছুই নাই এই কি তাহার যোগ্য পুরস্কার হইবে? কিন্তু উপায় কি? পীর সাহেবকে

ত অমান্য করাও যায় না! তবে? না, যে ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে তাহার পরিসমাপ্তি না হইয়া পারে না। ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে। সে চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া কাগজখানি আমেনার হাতে দিয়া অপরাধীর মত এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমেনা হাতের কাজ ফেলিয়া অতি কৌতুহলের সহিত খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া ভাবিল—বুঝি ঠাট্টা। কুদ্দুছের মুখের দিকে চাহিল, দেখিল—সে মুখ তেমনি শুষ্ক, ম্লান,—চাহনি তেমনি উদাস, করুণ! তবে কি এ সত্যই তালাক, চির জনমের বিচ্ছেদ? জিজ্ঞাসা করিল—কে লিখে দিলে, মৌলভী?

কুদ্দুছ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

হায় মূর্খ! তুমি সত্যই মূর্খ; তোমার কি একটুও বুদ্ধি নাই?

মুহূর্ত্তে সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল। পাড়ার আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলে সমবেত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিল; বহুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হইল—তালাক যখন কুদ্দুছের মত ও হাতের টিপ লইয়া হইয়াছে—তখন তাহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। হায় মূর্খ পীরে-পাওয়া-নরনারীর দল! অন্তরের সম্মতি ব্যতীত যে তালাক হয় না তাহা তোমাদিগকে কে বুঝাইবে?

উঠানে প্রতিবেশিনীর দল যখন আমেনাকে ঘিরিয়া আলোচনা করিতেছিল তখন কুদ্দুছ মিঞা ঘরের ভিতর শায়িত অবস্থায় উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয়ে ভাবিতেছিল—কি কঠোর দুর্ব্বিসহ এ জীবন। কর্ত্তব্যের সঙ্গে প্রাণের কি ভয়ঙ্কর বিরোধ! কি নির্ম্মম ভয়াবহ এ দূনিয়া!

আমেনাকে অতঃপর গাড়ী করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। সব ঠিক ঠাক হইয়া গেলে ছেলেটীকে ক্রোড়ে লইয়া সে যখন

গাড়ীর ভিতর গিয়া বসিল কুদ্দুছের পক্ষ হইতে জনৈক প্রতিবেশিনী আসিয়া ছেলেটীকে তাহার ক্রোড় হইতে তুলিয়া লইল। ছেলেটী কাঁদিয়া উঠিল; মায়ের প্রাণ বিচলিত হইল, বাহিরে কিন্তু কোনই চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে ছেলেটী যখ নতাহার চক্ষের অন্তরাল হইয়া গেল গাড়ীর ভিতর বালিশ মুখে দিয়া রুদ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। অন্তরের সংযত নিরুদ্ধ বেদনার উচ্ছ্বাস হঠাৎ আত্মপ্রকাশের পথ পাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। পরে উদাস আনমনা অবস্থায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কত কি, সেই প্রথম জীবনের কথা, তাহার মাতা ও পিতা তখনও বর্ত্তমান। মা ছিলেন সহরের মেয়ে, বিদুষী ও শিক্ষিতা তাঁহার কাছেই আমেনার প্রাথমিক বাংলা ও কোরাণ শরিফ পাঠ শেষ হইয়াছিল, পরে আত্মচেষ্টায় সেটা আরও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই মা মারা যান। বাপের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, তাহাতে আবার তাঁহার ঝোঁক ছিল কুলীনত্বের দিকে। কুদ্দুছদের অবস্থা সেকালে খুবই ভাল ছিল ও কুলীন বলিয়া ডাকনামও ছিল। কুদ্দুছের পিতাও তখন বিদ্যমান।

কুদ্দুছকে নিরক্ষর জানিয়াও বিনাপণে সম্বন্ধ হইলে আমিনার পিতা সে সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। বিবাহ হইয়া গেল, শীঘ্রই পরিচয় পাওয়া গেল—কুদ্দুছ কেবল নিরক্ষর নয়, একটু নির্ব্বোধও বটে। অনেকেই ঠাট্টা করিল! আমেনা একটু বিষণ্ণ হইল, পরে ভাগ্যকে মানিয়া লইল। লোকের উপহাসে সে ইদানীং স্বামীর উপর একটু সমবেদনা অনুভব করিতে লাগিল। কুদ্দুছ বুদ্ধিতে খাটো হইলেও আমেনাকে সে খুবই ভালবাসিত। আমেনাকে দেখিবার জন্য কতদিন কত বিপদ আপদ বাধা ভয় তুচ্ছ করিয়া দুপুর রাত্রে হঠাৎ শ্বশুর বাড়ি

গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কতদিন বাপের তহবিল ভাঙ্গিয়া স্ত্রীর জন্য কত কী আনিয়া দিয়াছে, পিতার তিরস্কার ও লাঞ্ছনাকে সে গ্রাহ্য করে নাই। পিতা মারা গেলেন। শ্বশুরও পারিবারিক কলহে আদালতের সাহায্যে অজস্র টাকা উড়াইয়া নিরক্ষর, অলস ও নির্ব্বোধ পুত্রের ঘাড়ে দেনা গ্রস্থ সংসারের বোঝা চাপাইয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর আমেনা তাহার নিজের গায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া স্বামীকে ঋণ মুক্ত করিল ও মোকদ্দমা আপোষে মিটাইয়া লইল। কালক্রমে তাহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। আমেনা কর্ম্মবিমুখ স্বামীকে বুঝাইল—দেখ, মাঠের ভুইগুলো বখরায় না দিয়ে নিজে একটু খেটে খুটে কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা দেখ। ছেলে হয়েছে, তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ ত করতে হবে? কুদ্দুছ বুঝিল ও সেই অনুযায়ী কাজ করিতে লাগিল, শীঘ্রই সংসারের অবস্থা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ মৌলভী সাহেব আসিয়া একদিকে দোজখের মহাবিভীষিকা অন্যদিকে বেহেস্তের প্রলোভন দ্বারা সকলকে বুঝাইলেন—দুনিয়া মিথ্যা, পরকালই সত্য। লোক দলে দলে মুরীদ হইয়া পরকাল উদ্ধারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। ঘর সংসার শ্মশান করিয়া দিয়া অনেক দিনের জীর্ণ পুরাতন মসজিদটাকে গোলজার করিয়া তুলিল। কুদ্দুছও এই হঠাৎ-মাতিয়া-উঠা ধর্ম্ম সাধকের দলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িল। মৌলভীর উপর আমেনার কম রাগ হইল না। কিন্তু মৌলভীর কি দোষ? লোকে যদি তাহাকে অমন্ করিয়া না মানিত তবে সে কী করিতে পারিত? নিশ্চয়, লোকের মূর্খতাই এ জন্য দায়ী। স্বামী যে মূর্খ তাহা সে জানিত কিন্তু তাহা জানিয়াও সে মৌলভীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে গেল কেন? মৌলভী ত চিরদিনই সেখানে

বাস করিতে আসে নাই! যেখানকার মৌলভী সেইখানেই চলিয়া যাইত, তাহার সংসার তাহারই থাকিত, স্বামী আবার পথে আসিত; অমন কতবার হইয়াছে; কিন্তু তবু? না, এ যেন কোন ভাগ্য দেবতার নিষ্ঠুর পরিহাস সে নাকি মানুষকে লইয়া এমনি ভাটা খেলে, আঘাত করিয়া, ব্যথা দিয়া আনন্দ বোধ করে।

গাড়ী তখন এক দুস্তর মাঠের ভিতর দিয়া জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্র। সময়ে সময়ে স্নিগ্ধ বাতাসের ঢেউ আসিয়া রৌদ্রের প্রচণ্ডতা শান্ত করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছে। গাড়োয়ান এক তরুণ বয়সের কৃষক; সঙ্গে যাইতেছে কুদ্দুছের এক প্রতিবেশী ভাই, নাম খোকা। গাড়োয়ান খোকাকে কহিল—খোকা, ভাবীকে জিজ্ঞেস করত পান আছে কিনা। খোকা গাড়ীর ভিতর মুখ প্রবেশ করাইয়া ডাকিল—ভাবী!

ভাবী হঠাৎ ভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে কহিল—পান আছে? আমেনা খুঁজিয়া বাটায় দেখিল—কয়েকটা পান ও সুপারি পড়িয়া আছে। বাটাখানা আগাইয়া দিয়া কহিল—বানিয়ে তুমি একটা খাও ও জমিরকে দাও।

—তুমি খাবে না?

—না?

খোকা পান তৈয়ারি করিয়া নিজে খাইল ও জমিরকে দিল। গাড়োয়ান পানটা খানিক চিবাইয়া লইয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া গান ধরিল—

"এ দুনিয়া গোলক ধাঁধাঁ ভাই মায়ায় বাঁধা ত্রিসংসার" * *

গানের সুরে আমেনার হৃদতন্ত্রী সাড়া দিয়া উঠিল। বাস্তবিকই

দুনিয়া গোলক ধাঁধাঁ। কেন সে জন্মিল, কেন সে তার পিতা মাতার স্নেহের ক্রোড় হইতে বঞ্চিত ও বিচ্যুত হইল? কেন সে সংসারকে অমন ভালবাসিল, কেন সে সংসার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল? সে যখন সংসারকে অমন ভালবাসিয়াছিল, কে জানিত সংসার তাহাকে অমন অপমানিত, দলিত পিষ্ট করিয়া ক্রীড়া পুত্তলিকার মত তুচ্ছ জ্ঞানে দূরে ফেলিয়া দিবে? কে জানে ভবিষ্যতেই বা কি আছে? তাহার বোধ হইল—জীবন যেন একটা দুর্ব্বোধ্য একটানা রহস্য—কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। শুধু এক দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের হাতে সকরুণ আত্মসমর্পণ ও আঁধারে হাতড়াইয়া মরা। গাড়ীর ফাঁক দিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল। দেখিল—আশে পাশের অগণিত বৃক্ষরাজি ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী উহারা! কত বার সে এই পথ দিয়া গিয়াছে আসিয়াছে, অমনি কত বাতাস ভরে মাথা দোলাইয়া তাহারা তাহাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইয়াছে, আজও তাহারা তেমনি আছে কিন্তু কি বলিতে চায় আমেনার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না।

পাখীগুলি অবিশ্রান্ত কিচির মিচির করিতেছে। কেমন শান্ত অনাবিল জীবন উহাদের! কত মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ উহারা! আমেনার ইচ্ছা হইল—সে যদি পাখী হইয়া জন্মিত! তাহার পর ভাবিল—ইহারাও যে খোদার সৃষ্টি, মানুষও সেই খোদার সৃষ্টি। ইহারা অমন সুখী, মানুষ অমন দুঃখী কেন?

সারা দুণিয়ার একছত্র অধিপতি মানুষ, যাহার ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের কুল নাই, তবু তাহার জীবনে সুখ কই, আকাঙ্খার তৃপ্তি কই? সে পরজীবনে বেহেস্ত চায়, ইহজীবনে তাহার কি নাই? ভবিষ্যতের নেশায়

ঘুরিয়া মরে, বর্ত্তমান তাহার কি জন্য অভিশপ্ত? আরও খানিক দূর অগ্রসর হইলে দেখিল—রাস্তার দুধারে খোলা মাঠের বুকে কতকগুলি লোক তাঁবু খাটাইয়া স্ত্রী পরিজন লইয়া বাস করিতেছে। বালক বালিকারা দূ'রে স্বচ্ছন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রী পুরুষেরা কেউ রাঁধিতেছে, কেউ বাঁশী বাজাইতেছে। কেমন মুক্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ উহারা! উহারাই বুঝি বেদে, উহাদেরই মেয়েরা গৃহস্থের বাড়িতে গুটি খেলিতে যায় ও বিনিময়ে চাউল ভিক্ষা লইয়া আসে। তাহার বাড়ীতেও অনেকদিন গিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া আমেনার মনে হইল—উহারা উহাদের মেয়েদের অবিশ্বাস করে না—আষ্টে পিষ্টে অমন বাঁধিয়াও রাখে না তবুও ত উহাদের চলে। বিবাহ প্রথা হয়ত আছে, তালাকের প্রথাও হয়ত আছে, কিন্তু তাহাতেও উহারা দুঃখী না। স্বামী যদি অত্যাচার করে বা তালাক দেয় তাহারা সহজ মনে নির্ব্বিকার চিত্তেই অন্য একজনকে গ্রহণ করিতে পারে তাহাতে উহাদের একটুও বেগ পাইতে হয় না; ইহার কারণ কি? বহু পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার অভ্যাসই কি ইহার কারণ? একজনকে স্বামীরূপে লইয়া থাকিলেও বহুর সঙ্গে উহারা তেমন একান্ত ভাবে অপরিচিত না, তাহার উপর আবার স্বাবলম্বী। ডরাইবে তবে কাহাকে? দুঃখ করিবে তবে কি জন্য? দুঃখ কি তবে বন্ধন? দুঃখ কি তবে পরাধীনতা ও পরনির্ভরশীলতা? হয়ত তাই! ভাবিতেই একটা উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে গাড়ী এক নদী-পার-হওয়া খেয়া ঘাটের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল—নানা শ্রেণীর অগণিত স্ত্রীলোক কেউ জল লইতে, কেউ স্নান করিতে ঘাটে

আসিয়াছে। কেউ জল লইয়া অথবা স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে। কেউ মূল্যবান গহনা ও শাড়ী পরিহিতা, কেউ সামান্য কাপড়ে আচ্ছাদিতা। আমেনার মনে হইল—ইহারা জানে না—কী হীন অপমান ও অবিশ্বাসের জীবন ইহাদের, কত অসহায়, পুরুষের কত অনুগ্রহ ও করুণার পাত্রী, পুরুষের কত হীন খেয়ালের পাশে বন্দিনী ইহারা! যদি জানিত এতখানি সৌখিনতা নিশ্চয়ই ইহাদিগকে লজ্জা দিত, কিন্তু জানে না সেটা ইহাদের দুর্ভাগ্য। স্ত্রীর দুর্ভাগ্যের কি কোন প্রতিকার নাই? তাহার ইচ্ছা হইতেছিল গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে যাইয়া ও সব বন্দিনী বোনদের ডাকিয়া তাহাদের অপমান লজ্জা ও দীনতার কথা বুঝাইয়া তাহাদিগকে মুক্তির নেশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে? যুগ যুগ ধরিয়া লজ্জা অপমান ও হীনতায় তাহারা এমনিই পোষ মানিয়া গিয়াছে যে অন্য কোন প্রকারের অধিকারের কথা তাহাদের একদম উপলব্ধিরই বাহিরে। তাহার মত অমন ঠেকিয়া শেখা ও আঘাত পাওয়া ক'জন আছে? এ সব কথা তাহাদের যদি কেউ বলে তাহারা তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে মাত্র।

পিত্রালয়ে আমেনার আছে মাত্র এক ভাই ও তাহার স্ত্রী। বাড়ী পৌঁছিলে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমেনার বড় ভাই ছেলে ও দেন মোহরের দাবী করিয়া কুদ্দুছ মিঞার নামে নালিশ করিতে চাহিলেন। আমেনা ভাবিল যাহার আশ্রয়ে সে এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছে, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া সে যাহাকে এতদিন ভালবাসিয়া আসিয়াছে আজ সে কেমন করিয়া তাহার সহিত মকদ্দমা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? আজ স্বামী তাহাকে হঠাৎ খেয়ালের মাথায় পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই কি তাহার সহিত এতদিনের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল? শুধু মুখের 'কথারই কি এত দাম? এতদিনের একত্র বসবাস, ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতিপ্রেমের আদান প্রদানের কি কোন মূল্য নাই? সে ভাইকে বুঝাইল—তাহাতে কাজ নাই; দেন মোহর না হইলেও তাহার চলিবে। সে যদি তাহার ছেলের মা হয় ছেলে মানুষ হইয়া আপনিই আসিয়া তাহাকে মা বলিয়া ডাকিবে। নালিশ করিয়া আনিবার কোন দরকার নাই। ভাই নিরস্ত হইলেন। বাৎসল্যের আতিশয্য পাছে তাহাকে তাহার এই সঙ্কল্প চ্যুত করিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলে সেজন্য সে সারাদিন নিজেকে সংসারের কাজে ডুবাইয়া দিয়া ছেলেকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত; এসার নামাজ অন্তে আমেনা কাতর প্রাণে খোদার নিকট প্রার্থনা করিত—খোদা যেন তাহার স্বামীকে ক্ষমা করেন। নিতান্ত নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ও পরের প্ররোচনায় স্বামী তাহাকে

ত্যাগ করিয়াছে, স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিলেও তাহার কাছে তাহার স্বামী স্বামীই থাকিবে। স্বামী ভুল করিয়াছে, তাই বলিয়া কি সেও ভুল করিতে পারে?

এদ্দতকাল ফুরাইয়া আসিলে যথা সময়ে মৌলভী সাহেব আঁসিয়া কুদ্দুছের ভাইয়ের নিকট আমেনাকে নিকাহের প্রস্তাব করিলেন। ভাই রাজী হইলেন। আমেনা কিন্তু বলিল—না, তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তাহার এখনও একটা সন্তান বর্ত্তমান। তাহার উপরও কি তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই? তাহা ছাড়া স্ত্রীলোক কি হাটের পণ্য সামগ্রী? পুরুষ হইতে পুরুষান্তার কেবল ঘুরিয়া বেড়াইবে? আত্মসম্মান বোধ কি তাহার থাকিতে নাই? ভাই পীড়াপীড়ি করিলেন না। মৌলভী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল—ছেলেটী মারা গিয়াছে ও কুদ্দুছ অন্যত্র নিকাহ্ করিয়াছে। ফলটী যেমন হঠাৎ বৃন্তচ্যুত হইয়া দিশাহারা অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া যায় সেও তেমনি পুত্রের মৃত্যুর ও কুদ্দুছের অন্যত্র নিকাহের সংবাদে মর্ম্মাহত হইল। অবলম্বন শূন্য হইয়া জগত সংসার অন্ধকার দেখিল।

তবে কি তাহাকে চিরদিনই ভাইয়ের গলগ্রহ ও ভাবীর ঈর্ষার পাত্রী ও চাকরাণী রূপে কাল কাটাইতে হইবে? হায় খোদা! একে ত স্ত্রীলোককে স্বাধীন ভাবে ও সম্মানের সহিত বাঁচিয়া থাকিবার কোনই উপায় রাখ নাই, তাহার উপর আবার এই গজব। এ তোমার কী পরীক্ষা, খোদা?

ভাইয়ের সংসারের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। কোন রকমে দিন গুজরাণ হইত মাত্র। উপর্য্যুপরি এই সকল দুর্ভাগ্যের ঢেউ

কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া সে পাড়ার ভিতর পরের বাড়ী কাজ করিয়া দিয়া নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে চাহিলে বংশ মর্য্যাদার হানি হইবে ভাবিয়া ভাই তাহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না।

আমেনা অগত্যা নিজেকে আরও গভীর রূপে সংসারের কাজে ডুবাইয়া দিল কিন্তু দিলে কি হয়, সে যে উপায়হীন, নিঃস্ব! ভাবী তাহার কাছে অশেষ উপকার পাইলেও নিঃস্ব ও উপায়হীনা ভাবিয়া কারণে-অকারণে খোঁচা দিতে ছাড়িবে কেন? জগতে যাহারা নিঃস্ব ও উপায়হীন তাহাদের ভাগ্যই বুঝি ঐ।

আমেনা ভাবিল—ইহা অপেক্ষা নিকাহ করায় দোষ কি; স্বামী ত তাহাকে ত্যাগ করিয়াই শেষ করে নাই! আবার অন্য একজনকে গ্রহণ করিয়াছে সেই বা তাহা পারিবে না কেন? যে তাহাকে অমন নির্দ্দয় ভাবে ভুলিতে পারিয়াছে সেই বা তাহাকে পারিবে না কেন?

ভাব গোপন রহিল না, ভাইয়ের কাণে গেল। ভাই পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু তালাক দেওয়া মেয়ের সৎপাত্র মেলা দায়। প্রতি-বেশিনীরা আসিয়া বুঝাইল—মৌলভীকে নিকাহ করায় দোষ কি? হাজার হইলেও মৌলভী; চাষা নয়, গোঁয়ার নয়, ভদ্রলোক। তাহার সংস্পর্শে সে বরং সুখেই থাকিবে। আমেনা শেষে রাজী হইল। প্রায় ছয় মাস পরে মৌলভী আসিয়া আমেনাকে নিকাহ করিয়া লইয়া গেলেন।

আমেনা চলিয়া গেলে কুদ্দুছ নিজেকে প্রবোধ দিতে চাহিল—সে যাহা করিয়াছে ভালই করিয়াছে। পরকালের পথ ত পরিস্কার হইল! কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? পরক্ষণেই আমেনার অভাব জনিত হাহাকার তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। হয়ত ক' ফোঁটা অশ্রু তাহার নিষেধ সত্বেও চোখের কোণে উছলাইয়া উঠিত; হয়ত একটু বিরক্ত হইয়াই সে আবার তাহা মুছিয়া ফেলিত। ক্রমে ব্যথা আরও দুঃসহ, অন্তরের অশ্রুসাগর আরও অপ্রবোধ্য দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইত—কিছু দিন স্থানান্তরে কোনও কুটুম্ববাড়ি গিয়া আমেনাকে ভুলিয়া আসে, কিন্তু ছেলেটীকে কি করিয়া যাইবে? তাহাকে তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলে হয় না? কিন্তু পাঠাইয়াই বা সে কি লইয়া থাকিবে?

সারাদিন মাঠে পরিশ্রমের পর সে যখন বাড়ী আসিত সারা বাড়ী যেন কাহার বিরহে হাহাকার করিয়া উঠিত—যেন অনুযোগ করিতে চাহিত—ওগো, সে কৈ? বাড়ীর প্রত্যেক জিনিষটা আমেনার কত ঐকান্তিক যত্ন, সেবা ও শ্রমশীলতার চিহ্নমাখা। এখন সেগুলি কত ম্লান, শুষ্ক, কাতর! সারা বাড়ী যেন শ্মশানের বিভীষিকা মাখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। দোজখ, সে কি ইহা অপেক্ষাও ভীষণ? খোদা কি এতই কঠোর, নির্ম্মম ও নির্দ্দয়—প্রাণের পরে তাঁহার কি একটুও দরদ নাই?—মানুষের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাকে কি সে একটুও ক্ষমা দিতে পারে না?

ইচ্ছা হইত—ছুটিয়া পালায়, কিন্তু কোথায় যাইবে? এ তবু

তাহার আমেনারই স্মৃতিজড়ানো চিহ্নটুকু, তাহার চৌদ্দ পুরুষের বাস্তু ভিটা, কত সহস্র রজনীর ভালবাসা মাখা, কত মধুর, কত সকরুণ ব্যথা উদ্দীপক! এ যদি তাহাকে দগ্ধাইয়া মারে তবু সে কি ইহা ছাড়িতে পারে? এ বাড়ীর সঙ্গে যে স্মৃতিজড়ানো সে তাহাকে পীড়া দেয়—ব্যথিত করে, কিন্তু সে ব্যথা কত মিষ্ট—সে পীড়া কত করুণ আকাঙ্ক্ষনীয়! ঐ পীড়া ও ব্যথাকেই ত সে চায়। তবে কি সে তাহাকে তালাক দিয়া ভুল করিয়াছে? সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল, হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভাবিত—না, ভুল করে নাই, ঠিকই করিয়াছে। পীর সাহেবকে সে গালি দিতে গেল কেন?

পাড়ার কোন বর্ষীয়সী মহিলা তাহাকে রাঁধিয়া দিত, কিন্তু সে রান্না তেমন ভাল লাগে কৈ, পরিবেশনে সে মাধুর্য্য কৈ? সে আপন আপন ও অপরিসীম স্নেহ ভক্তি ও অনুকম্পার ভাব কৈ? অশ্রুবেগ আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। আধ পেটা খাইয়াই উঠিয়া পলাইত। ঘরে গিয়া খোকাকে বুকে করিয়া খুব খানিক কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মায়ের সম্বন্ধে কত কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, তাহার কতকগুলি খোকা বুঝিত, কতকগুলি বুঝিত না। তবু সে তাহার আধফোটা সুকুমার ভাষায় তাহার সবগুলিরই একটা না একটা উত্তর দিত। কুদ্দুছের হঠাৎ মনে হইত—আচ্ছা, তোওবা করিলে ত গোণা মাপ হয়! আমেনা যদি তোওবা করে তবে সে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে না? কিন্তু তালাক দেওয়া স্ত্রী পুনরায় গ্রহণ করা যায় কিনা সেও ত মস্‌লা মসায়েলের কথা! অনেককেই জিজ্ঞাসা করিল, কেহই সন্তোষ-জনক উত্তর দিতে পারিল না, পারিলেও তাহাতে তাহার সন্দেহ ঘুচিল

না। সে বিক্রমপুরের পীর সাহেবের নিকট ফতোয়া চাহিল। পীর সাহেব কহিলেন—সে হয় না, তবে যদি কেহ নিকা করে ও তালাক দেয় তবেই—। ইহাতে কুদ্দুছের রুচি হয় না, তবু সে ফতোয়ার কথা আমেনাকে বলিয়া পাঠাইল। আমেনা রাজী হইল না। ইহার কিছু কাল পরেই ছেলেটা হঠাৎ জ্বর রোগে মারা যায়। তাহার ব্যথা ও শোক-সাগর আরও অবুঝ উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে নামাজ রোজা কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিন রাত্রি ঘরে পড়িয়া থাকিয়া যেন শুকাইয়া মরিবার সঙ্কল্প করিল। ভাবগতিক দেখিয়া পাড়ার মুরুব্বিরা তাহাকে এক বয়স্থা পাত্রীর সঙ্গে নিকাহ দিয়া দিল। নূতন স্ত্রীকে কুদ্দুছ প্রথমে আমেনা মনে করিয়াই লইতে চাহিল কিন্তু পারিল না। সে ছিল কি, আর এ কি! কুদ্দুছের চেহারা নেহাত মন্দ ছিল না। এ তাহাকে খুব ভাল বাসিতে চাহিলেও সে ভালবাসায় তেমন মাধুর্য্য ও মিষ্টতা কৈ? সে মোহ ভরা স্নিগ্ধতা, আপন করিয়া লইবার মত সে সুগভীর আগ্রহ ও আকাঙ্খা কৈ? অভাব মিটিল না! তুলনায় অসন্তোষের আগুণে জীবন আরও বিষাক্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করিবে? উপায় কি? একবার ইচ্ছা হইল—ইহাকে তালাক দিয়া সে যাহা ছিল পুনরায় তাহাই হয় কিন্তু তালাকের নামে তাহার ভয় হয়। একবার তালাক দিয়াই ত এই অনর্থ ঘটিয়াছে। কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না অথচ না করিলেও নয়। জীবন ক্রমে নিরানন্দে বিতৃষ্ণায় মরণাকুল হইয়া উঠিল।

হঠাৎ একদিন শুনিল আমেনাকে তাহারই সেই পীর সাহেব নিকা করিয়া লইয়া গিয়াছে; প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না কিন্তু সন্ধান

লইয়া জানিল—সত্যই। আক্রোশে, অনুতাপে, হাহাকার ও মর্ম্মপীড়ায় তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল। এত বড় মূর্খ সে! এত বড় একটা ভণ্ড পিশাচ মৌলভীর মুরীদান সে! আজও সে তবে কিজন্য দুনিয়ায় বাঁচিয়া আছে? তাহার ইচ্ছা হইল মৌলভীকে যদি একবার হাতে পাইত! না থাক, খোদাই ইহার বিচার করিবেন। হায় কপাল! দুনিয়া যে এমন তাহা আগে কে জানিত?

(১৭)

মৌলভী সাহেব কহিলেন—ধরাই যদি দিলে এত কষ্ট দিয়ে দেরী করে কেন ?

আমেনা—মেয়ে মানুষ জিনিষটা আপনারা যত সস্তা মনে করেন আমি তা করি নে, আক্রা জিনিষ পেতে হলেই একটু কষ্ট ও দেরী করে পেতে হয় বই কি!

—না সত্যিই, হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

—ভিখারীকে ফিরিয়ে দিয়ে পরে তার উপর দয়া হ'ল, এমন হয় না?

—কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছিলে কেন তাই জিজ্ঞেস করছি।

—দিয়েছিলাম এই জন্যে যে পুরুষ জাতটার উপর আমার আদৌ বিশ্বাস নেই।

—কেন?

—তা বুঝি আপনি জানেন না? ভেবে দেখুন আপনিই না কতকগুলিকে তালাক দিয়েছেন?

—ও, এই জন্যেই, তবে আবার কি মনে ক'রে শেষে বিশ্বাস করলে?

—বিশ্বাস করিনি, তবে ভাবলাম পরের গলগ্রহ হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে, যেখানে বেঁচে থাকার কোন মূল্য পাওয়া যায় সেখানে থাকাই ভাল।

—কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করনা? আমি যে তোমাকে এত ভালবাসি? আমেনা!

—ভালবাসেন এখন, দুদিনের জন্য লালসায়, পরে আর বাসবেন না। আপনি যাকে তালাক দিয়েছেন, তাকেও প্রথমে ভালবেসেই নিয়েছিলেন পরে আবার তেমনি নিষ্ঠুর হয়েই ছেড়েছেন, কেমন না? বলিয়াই ভাব গ্রহণের নিমিত্ত মৌলভীর মুখের দিকে তাকাইল!

—যাকে তালাক দিয়েছি সে কি আর তোমার মত এমনটী, এমন খুবসুরত?

—খুবসুরত না হওয়াটা বুঝি তার অপরাধ? আপনারা না খুব খোদা মানেন? খুবসুরত মানুষ নিজে হয়, না খোদা করে?

—খুবসুরত খোদাই করে আবার খুবসুরতকে ভালবাস্‌তে খোদাই শেখায়। কিন্তু শুধু সে জন্য না, আরও অনেক কারণ আছে যা তোমাকে সব বুঝান যায় না।

—আমাকে যে তালাক দিয়েছে তারও হয়ত অমন অনেক কথা আছে যা কাকেও বোঝান যায় না; কিন্তু ওকে ভালবাসা বলে না; সত্যিকার ভালবাসা সব বরদাস্ত করতে পারে। অনেক কথা থাকলেও তা বিবেচনায় আনে না।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে সত্যিই সত্যি করে ভালবাসি। খোদার কছম, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—কখনো তোমাকে ছাড়ব না।

আমি যদি এমনটী না থাকি, ধর যদি কোন ব্যায়রাম হয়ে বিশ্রী কাল হয়ে যাই।

—তা হলেও, তাই বলে তা হতে যেন ইচ্ছে কর না।

—ইচ্ছে করলেই বুঝি হওয়া যায়!

—যায় না ত কি? খোদা অনেক প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন।

—প্রার্থনা করব? সম্বল মাত্র আছে ঐ রূপটা তা' আবার প্রার্থনা করে নষ্ট করব এতখানি বিশ্বাস আমি দুনিয়াকে করিনে। ভাগ্যক্রমে যদি হই তাই বল্‌ছি।

—ভাগ্যক্রমে হয়ে কাজ নেই, তুমি যেমন আছ তেমনিই থাক। আমার কষ্টের ধন, মাণিক, আমার বুক জুড়ানো, পরাণভরা! বলিতে বলিতে গলাটা বাহুবেষ্টনে আগাইয়া আনিয়া মুখখানিতে একটা চুমা দিলেন। আমেনা আপত্তি করিল না। মৌলভী আবার চুমা দিলেন। আমেনা এবার বাহুবেষ্টন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও, অত আদর করতে হবে না। বু' কি করছে দেখিগে!

—বু' যা করছে করুক গে, তুমি এখন যেতে পারবে না। বলিয়া পুনরায় বাহুপ্রসারণ দ্বারা গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কোলের দিকে আকর্ষণ করিতে চাহিলে আমেনা সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া বিরক্ত ভাবে কহিল —সর, বু এসে দেখ্‌তে পেলে কিন্তু ভারি বকাবকি করবে। দিন দুপুরে ও কি?

—বু'র বকাবকির অত ভয় কেন? বু' ত তোমার মনিব না!

—মনিব না, কিন্তু মনিবের চেয়েও অনেক। তার অধিকারে আমি ভাগ নিয়েছি।

—তার কি অধিকার?

—স্বামীর সব কিছুতেই স্ত্রীর অধিকার।

—কিন্তু সে যেমন এক স্ত্রী, তুমিও তেমনি আর এক স্ত্রী। তার ও তোমার সমান দখল।

—কিন্তু সে ত আর আশা করেছিল না আমি আসব!

—আশা করেছিল না তাতে কি? যার কপাল তার, কপালের ভাগ কি কেউ কারও নিতে পারে?

—শুধু কপাল হাতে ক'রেই মানুষ বসে থাকে না, কপালকে হটিয়ে দিতে পারলে মানুষ কিছু কম করে না।

—বু'র পরে ভারি দরদ দেখ্‌ছি, সে তোমায় এত বশ্য করল কি দিয়ে? বড্ড ত ভালবাসে?

—না বাসুক, তবু সে বেচারী!

—বেচারী কিসে?

—বেচারী নয়? তুমি একটার পর একটা নিকে ক'রে আন্‌ছ, এতে ক'রে তার মনে কি খুব ভাল বল্‌ছে? তার পাঁচটা ছেলে মেয়ে হয়েছে, সংসারের অবস্থা ত ঐ?

—সে ভাবনা যার ভাববার তিনি ভেবে রেখেছেন, তোমার আমার না ভাব্‌লেও চলবে। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

—দিলেই ভাল, আমি এখন আসি! 'খোকা বুঝি কাঁদছে, ধরিগে' বলিয়াই রান্না ঘরের দিকে যাইতে উদ্যত হইলে মৌলভী সাহেব

তাড়াতাড়ি তাহার আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন—যেও না. তোমার পায়ে পড়ি।

আমেনা বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া কহিল—কী মুস্কিল! খোকা কাঁদছে শুনতে পাচ্ছ না!

—কাঁদুক, তার মা আছে, ধরবে।

—মা রাঁধছে না?

—এতদিন কে ধরেছিল?

—যেই ধরুক, এখন ওসব আমার ভাললাগবে না। বলিয়াই আঁচলটা কোনক্রমে ছিনাইয়া লইয়া রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল। খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া রান্নারত বু'কে গিয়া কহিল—কি করছ, বু?

—এই দেখ কি করছি, বাঁদী যা করে তাই।

কথাটা তীক্ষ্ণ ও খোঁচা দেওয়া, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়, তাই তাহাতে ব্যথা না পাইয়াই আমেনা তেমনি মোলায়েম স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল—তুমি না হয় সর, আমি রাঁধছি, খোকাকে দুধ দাও, এর বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে।

—না, না, বোন, অত খাতির করতে হবে না তুমি যাও, যে কাজে এয়েছ তাই করগে; ওদিকে তোমার বুঝি সে ছট্‌ফট করছে।

বু'র মুখখানি তেমনি গম্ভীর ম্লান!

এবার একটু ব্যথিত অথচ অনুকম্পার স্বরে আমেনা কহিল আমার উপর খাপ্পা হ'ওনা বু, আমি ইচ্ছে করে আসিনি, আমি তোমার চেয়েও হতভাগী। সমস্ত মুখ কাতরতায় ভরা। বু এবার মুখ

তুলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন—সেও তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কি করুণ বিষাদমাখা সেই চাহনি! বু'র বোধহয় একটু দয়া হইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছেলেটীকে তাহার ক্রোড় হইতে লইয়া কহিলেন, মাছগুলো ভাল ক'রে ভেজে নাও। পরে পিঁড়ার উপর উপবেশন করিয়া ছেলেকে দুধ দিতে দিতে কহিলেন—মৌলভী কি করছে?

—জানি না ত! আমি যখন এসেছিলাম তখন ঘরেই ছিল।

—মিন্‌সের বাতিক দেখ, একটার পর একটা আন্‌ছে, আর ছাড়্‌ছে; যেন ব্যায়রামে ধরছে! মুখ পোড়া লম্পট কোথাকার!

আমেনা কড়াইয়ে মাছ উল্টাইয়া দিতে দিতে কহিল—পুরুষ জাতটাই অমন।

—পুরুষ জাতের কথা ব'ল না। আর কি দেশে পুরুষ নেই? সবাই কি অমন করছে? দু'একজন ছন্ন ছাড়া পুরুষ অমন হয় অথচ মজা দেখ কোন মেয়েলোক যদি অমন কিছু করে তার দুর্গতি ও লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। আমাদের গ্রামের এক ছুড়ী—আহা, মেয়ে না যেন অপ্সরা! বিয়ে হয়েছিল এক বুড়োর সঙ্গে। বেচারি তাকে ভালবাস্‌তে পারে নি—পাড়ার এক ছোকরার সঙ্গে গোপনে পীরিত করেছিল। তাই নিয়ে তার যে লাঞ্ছনা! আদালতের বিচারে ছোক্‌রার জে'ল হ'ল। ছুড়ীকে বুড়োর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। শেষে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হ'ল। এমনি কত হচ্ছে—কে দেখে, কে ভাবে, কে কার খোঁজ নেয়?

এমন সময় হঠাৎ মৌলভী সাহেব আসিয়া পড়িয়া কহিলেন—কি হচ্ছে, ভাত হ'ল?

ছোট বউ মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। বড় বউ কহিলেন—হ'ল, কি কাজ ক'রে ক্ষিদে পেয়েছে?

—ক্ষিদে পায়নি, তবে ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুম পাচ্ছে!

—হ্যা, আশ্চর্য্য হয়ে গেলে যে!

—হবারই কথা, এত শিগ্‌গির ঘুম পাবে, শীকার ধরে নিয়ে এলে তবে কি জন্যে?

—সত্যি বড় বউ, আজ আমরা এক ঘরে শোব, হ্যা?

—হ্যা, যাও, ভাত হয়ে গেলে ছোট বউ ঘরে নিয়ে যাবে এখন।

—না, ঘরে নিয়ে যেতে হবে না, আমি এখানেই খাব।

—এখানে এই নোংরা অপরিষ্কারের ভিতর?

—অপরিষ্কার কিসে হ'ল? তোমরা যেখানে আছ সেখান আবার নোংরা অপরিষ্কার? এখানেই আমার বেহেস্ত—তোমারাই আমার হুর গেলেমান। বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

—আ! মিন্‌সের রকম দেখ! এখানেই বেহেস্ত হলে আর দিন রাত তস্‌বি টিপ্‌তেন না!

—তসবি টিপি কি আর বেহেস্তের জন্য? তস্‌বি টিপে মুরিদান না জুটলে তোমাদেরই বা খোর পোষ যোগাব কি দিয়ে। তস্‌বি টেপাও সে তোমাদের দায়ে। বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

—আঃ মিন্‌সের রগড় দেখ, বুড়ো বয়সে যেন আগ্‌লেছে!

—বুড়ো বয়স!

—না, তুমি আজও ষোল বছরে খোকা!

—বুড়ো কাকে বলে? বুড়ো সেই যার দাঁত পড়ে গেছে, চোখে দেখ্‌তে পায় না।

—তুমি দেখ্‌তে পার—মেয়ে মানুষের রূপ, খেতে পার মেয়ে মানুষের মাথা। গু খেগো কুক্কুর কোথাকার!

অনুযোগের স্বরে মৌলভী সাহেব কহিলেন—না, তোমার কাছে দেখ্‌ছি আমার আর মান টান থাক্‌ল না, তুমি যা তা বল, আমি এই চল্লাম। বলিয়াই যাইতে উদ্যত হইলেন।

—কোথায় যাচ্ছ! ভাত হয়ে গেল, খেয়ে যাও।

মৌলভী সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—ভাত হয়েছে? তবে দাও।

—এই একে ধর, বেড়ে দিই।

—ছোট বউকে বল না হয়, বেড়ে দেবে এখন।

— আহা, আমার হাতে আর রুচ্‌ল নাগো!

—রুচ্‌বে না কেন! তোমার কোলে খোকা তাই বল্‌ছি।

—দাও গো দাও, ছোট বউ ভাত বেড়ে দাও, ও এখন রাখ, আমি করব এখন।

ছোট বউ উঠিয়া আসিয়া কহিল, খোকাকে আমার কাছে দিয়ে তুমিই বেড়ে দাও।

—না গো না, বল্‌ছি শোন না!

ছোট বউ একটু অপ্রভিত হইয়া থাল ধুইয়া ভাত বাড়িতে লাগিল। মৌলভী সাহেব দেখিতে লাগিলেন—কি সুন্দর সেই হাত নাড়া! কি মধুর কর্ম্মরত সেই মুখখানা ও দেহটা! খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন—বা! বা! বেশ রান্না ত! ছোট বউ বেশ রাঁধে ত।

ছোট বউ মিট্‌কি হাসিতেছিল। বড় বউ উগ্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে মৌলভীর দিকে চাহিয়াছিলেন।

খাওয়া শেষ করিয়া মৌলভী সাহেব ঘরে আসিলেন। খানিক পরে তাহারাও দু'জনে খাইয়া ঘরে গেল। পান খাওয়া শেষ করিয়া বড় বউ দরজার নীচে বারান্দায় বিছানা পাতিতে লাগিলেন। ছোট বউ কহিল—তুমি ঘরে শোও বু, আমি বাইরে থাকি।

—হ্যাঁ, তোমাকে বাইরে রাখবার জন্যেই সাত মুল্লুক ঘুরে জোগাড় করে এনেছে। ছোট বউ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। পরে কহিল —তবে এস আমরা দু'জনেই ঘরের ভিতর মেঝেয় শুই, উনি উপরে থাকুন।

—সে হয় না আমি যা' বলি শোন না! আমাকে বেশী বকিও না, আমার শরীর ঠিক নেই। যাও, ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়্‌গে।

ছোট বউ অপ্রস্তুতের মত খুব খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ভিতর হইতে খিল আটিয়া দিয়া মেজেয় বসিয়া রহিল। মৌলভী সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন, এইবারে উঠিয়া আসিয়া ছোট বউয়ের হাত ধরিয়া তুলিলেন, পরে আস্তে আস্তে বিছানায় আনিয়া নিজের পাশেই একই বালিশে শায়িত করাইলেন। ছোট বউ চুপি চুপি কহিল এখন ঘুমোও, আমার ঘুম পাচ্ছে। অনেক কথা বার্ত্তার পর যখন বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল তখন বাহিরে বড় বউ বোধ হয় ঘুমাইয়াছে।

প্রায় বছর দুই পরে প্রকাশ পাইল—ছোট বউ অন্তসত্ত্বা। বড় বউ কহিল—হ্যালা, তুই যে বলেছিলি—হবে না।

—না-হওয়ার ত ওষুধ খেয়েছিলাম, খাট্‌ল কৈ ?

—কেন, ওষুষ খাবি কেন, খাটে নি তাতেই বা দুঃখিত হচ্ছিস কেন? একটা ছেলে পিলে হবে না তবে কি জন্য দুনিয়ায় আসা ? দুঃখ অবশ্য হয় যে হয়ে থাকে না। আমার এক পাল ছেলে মেয়ের মধ্যে মাত্র ঐ তিনটুকু বর্ত্তমান। তাও আবার কোনদিন যায় কি থাকে। মনে হয় যেন যম ওত পেতে বসে রয়েছে।

—ঐ জন্যেই ত বু ও সব চাই নে! আমার খোকার কথা মনে হলে আজও জান ফেটে যায়। মরবার কালে একবার দেখতেও পেলাম না!, এমনি পোড়া কপাল! বলিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল।

বড় বউ সান্ত্বনার ছলে কহিল—তা আর দুঃখ করে করবি কি ? কপালে ছিল ঐ। বাস্তবিক ছোট বউ বিশ্বাস করিস কি না! তোর পরে আমার ভারি মমতা হয়—সতীনের পরে কারও কখন এমন হয় কি না জানিনে।

—সেটা আমার সৌভাগ্য বোন, সৌভাগ্য। জীবনে মা বাপ মারা যাওয়ার পর কারও কাছে কোনদিন একটু ভাল মুখ পাইনি, তোমার কাছে যে তা পাই সে আমার সৌভাগ্য। বলিতে বলিতে মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল।

—সত্যিই তোকে আমার বড্ড ভাল লাগে। আমার একটা লাভও

হয়েছে। আগে মৌলভী ছায়েলিতে যেত, একলাটি এই বাড়ীতে পড়ে থাক্‌তে হ'ত, কত ভয়। ছেলে মেয়ের অসুখ হ'লে বড্ড বিপদে পড়তাম। এখন কিন্তু মৌলভী আর বেরোয় না।

—আচ্ছা মৌলভীকে ত মন্দ লোক বলে বোধ হয় না!

—মন্দ ত নয়! তবে দোষের মধ্যে বড়ই লম্পট। একটা সুন্দর মেয়ে মানুষ দেখলে আর রক্ষে থাকে না। পাওয়াই চাই। এখন সেটা সেরেছে, চিরদিন কি আর মানুষের সমান যায়?

মৌলভী সাহেব হয়ত আড়াল হইতে শুনিয়াছিলেন। এক গাল হাসি লইয়া বাড়ী ঢুকিয়া কহিলেন—কৈ, কি বলা হচ্ছিল সব?

বড় বউ কহিল—বল্‌ছিলাম কি তোমাকে বেঁধে আমরা একদিন মারব।

—কেন, অপরাধ?

—অপরাধ? তুমি সারাদিন থাক কোথায়?

—থাক্‌ব আর কোথায়, দূরে ত আর যেতে পারিনে, আশে পাশেই ঘুরতে হয় কিছু রোজগারের চেষ্টায়। কিন্তু আশে পাশে ত আর তেমন পসার নেই! বড় মুস্কিলে পড়েছি, কি করেই যে সংসার চালাই?

—এক কাজ কর—আমাদের একজনকে বেচে ফেল, তাতে তোমার খরচও কম্‌বে কিছু সম্বলও হবে। তারপর আর একটা আনবে, আবার ও রকম বিক্রী করবে। তোমার ত আর আন্‌তে পয়সা কড়ি লাগে না! বিক্রী করে বরং দু' পয়সা পেতে পারবে।

—ছি, অমন কথা ব'ল না বড় বউ, তোমাদের ছেড়ে আমার এক পাও কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

—আমাকেও না?

—কেন, তুমি কি আমার কম? তুমি না আমার খোকার মা?

ছোট বউয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া—ও-ও ত তোমার খোকার মা হ'তে যাচ্ছে।

—(সোৎসাহে) কি বল্‌লে? খোকার মা হবে? পোয়াতি?

—হা, অবাক হয়ে গেলে যে, যা খেতে চায়, এনে দিও।

তবুও ভাল—আমার ভয় হ'ত—ছোট বউকে যদি দৈবাত হারিয়ে ফেলি, তবে কোন নিশানাই থাকবে না আমার কাছে। এখন শুনে আশ্বস্ত হ'লাম।

ছোট বউ ঘোমটার আড়ালে মৃদু হাসিতেছিল। বড় বউ কহিল—মেলা ছেলে পুলে ত হ'তে চল্‌ল, তোমার পসারও এদিকে কমে এসেছে। এক কাজ কর—বড় ছেলেটাকে একখানা হাল করে দাও, ও ফকিরি ব্যবসা ওকেও আর শিখিও না। বাড়ীর আশে পাশে কিছু জমি ঘিরে আমরা সেখানে শাক, তরী-তরকারী করব।

—জমি ঘিরলেই হ'ল? চাষ করতে হয় না?

—চাষ আমরা করব কোদাল দিয়ে।

—তোমরা কোদ্‌লাতে পার?

—কেন পারব না, দায়ে পড়লে সব পারতে হয়। অন্ততঃ ও ছেলেটাকে তুমি আর ফকিরী ব্যবসা শিখিও না। লোকের দোর দোর ঘুরে মেয়ে মানুষ দেখে বেড়ান ভাল লাগে না।

—ছি, ফকিরী ব্যবসা বল্‌তে নেই, গোণা হয়।

—তা হ'কগে গোনা, গোণা না হলে আমি একেবারে স্বর্গে যাব।

—স্বর্গ না, বেহেস্ত বল্‌তে হয়।

—হ'ল সেই বেহেস্ত, তাতে আমার কাজ নেই।

—দেখ, অমন ইমান বেঠিক করতে নেই। আমাদেরই যদি ইমান না থাকে, লোকে মান্‌বে কেন ?

—লোকে দেখ্‌তে যাচ্ছে আমার ইমান ?

—না, দেখে না ত কি ? তুমি একটা বেইমানি কথা বল্লে, পাড়ার কোন মেয়েলোক তা শুনে গেল, সে আবার যেয়ে গল্প করলে, এমনি করে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশ।

—আচ্ছা, এমন ক'রে লোক না ঠকালে হয় না ?

—লোক ঠকালাম কি ক'রে ? লোক ত আপনিই আসে, আর আসে কি সাধ ক'রে ?

—বোকা লোক গুলোও তেমনি, আর কাজ পায় না এখানে আসে পুণ্যি কুড়োতে !

—পুণ্যি কি আর আমি দিই ? খোদার কালামে দেয়।

—খোদা আর মুল্লুকে জায়গা পায় নি তোমার কালামের ভিতর গিয়ে ব'সে রয়েছেন।

—খোদা তবে কালাম দিয়েছে কেন ?

—খোদা দিলে কি কে দিলে কে জানে ?

—'খোদা দিলে কি কে দিলে' বেইমান কোথাকার !

—আচ্ছা হলাম হলাম বেইমান, যাও।

—দেখ, আমি বাড়িতে ওরস শরিফ করছি, তুমি একটু সাবধানের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইবে। লোকে টের না পায়—তুমি বেইমান।

—ওরস শরিফ মানে ?

—মুরীদানদের নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালে বাড়িতে এসে মৌলুদ শুনে যাবে।

—তোমার লাভ ?

—টাকা দেবে।

—কেন ?

—নজরাণা।

—ও! আচ্ছা কর, দেখা যাক তোমার কেমন ওরস শরিফ।

—তুমি একটু সাধবানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবে।

—আচ্ছা কইব।—তুমি এখন গোয়ালা বাড়ি গিয়ে একটু ঘোল নিয়ে এস, আর হাটে কাগ্‌জে লেবু কিনবে ছোট বউয়ের জন্যে। ওর অরুচি হয়েছে, বুঝ্‌লে ?

—o—

কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রায় সপ্তাহের ভিতর আকবর শ্বশুর বাড়ীর চিঠিতে সংবাদ পাইল—পীর সাহেবকে গালি দেওয়ায় কুদ্দুছ তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে; সুতরাং জাহানার পড়া শুনা বন্ধ। সংবাদ পাইয়া জাহানারার পড়া শুনা বন্ধ হওয়ায় যত না দুঃখিত হইল আমেনাকে তালাক দেওয়ায় তদপেক্ষা অধিক দুঃখিত ও বিস্মিত হইল। সমুদয় ব্যাপারটা সে একপ্রকার অনুমানে ভাবিয়া লইল। হয়ত পীরের প্ররোচনা ও দুরভিসন্ধি ইহার পিছনে আছে। সে আমজেদকে গিয়া কুদ্দুছ ও বাহাছ সভা সম্পর্কে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া বুঝাইতে চাহিল—সে যে ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত, সে কেবল এই জন্যই—ধর্ম্মই মানুষকে অমন বিকৃত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

—আমজেদ কহিল—কোন ধারাল ছুরি দিয়ে কলম কাট্‌তে গিয়ে কেউ যদি হাত কেটে ফেলে সেজন্য দায়ী হবে কি ছুরি?

—কলম কাটার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ লোকই যে ছুরিতে হাতই কেটে ফেলে সে ছুরিকে ত বিশ্বাস করাও ভাল নয়? মানুষ খোদার সৃষ্টি, খোদার সৃষ্টি যদি নিন্দনীয় হয় খোদার সৃষ্টির সৃষ্টি তাহ'লে আরও নিন্দনীয়।

—ধর্ম্মটা তোমার মতে তবে কিছু না।

—দেখ, ধর্ম্ম কথাটা তোমরা এমন ভাবে ব্যবহার কর যেন ও একটা নির্দ্দিষ্ট কিছু, যেন ওর মানে সবার কাছে এক এবং সমান স্পষ্ট। কিন্তু

তাই কি ? পৃথিবীর কোটি কোটি মানব সবাই কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে একমত ? হিন্দু যাকে ধর্ম্ম বলে মুসলমান তাকে বলে না। তোমার এবং আরও অনেকের মতে ধর্ম্ম মানে হয়ত কোরাণ ও রসুলকে মানা। আমার এবং আরও অনেকের মতে কিন্তু তা না। আমার মতে জীবনের যাতে উৎকর্ষ তাই মানুষের ধর্ম্ম। জীবনের কিসে উৎকর্ষ তার dictator তোমার কোরাণ না, আমার বিবেক।

—বিবেক কি সবারই এক ?

—তার আগে জিজ্ঞেস করি—মানুষ কি সবাই এক ? মানুষের ভিতর ব্যক্তিত্ব, বৈচিত্র ও বিভিন্নতা নেই কি ? তার তা থাকা সত্বেও ত চল্‌ছে। সত্যি বটে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র থাকার দরুণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঠোকাঠুকি ও সংঘর্ষ আছে ; কিন্তু সে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্রকে ছেটে ফেলাও ত যায় না, বরং এই ব্যক্তিত্ব বৈচিত্র ও বিভিন্নতা আছে বলেই মানুষের দুনিয়ার এমন সমৃদ্ধি ও গৌরব। বিবেকের বৈচিত্র যদি স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাতে দোষ হয় কি ? লাভ বই লোকসান কি ? মানুষের দৈহিক চেহারায় যদি বৈচিত্র থাকে ও তা থাকায় চলতে পারে মনের চেহারায় তা থাক্‌বে না কেন ও চল্‌বে না কেন ?

মানুষ এক না, এক এবং বহু। সব মানুষের দু'খান হাত, দু'খান পা, দুটো চোখ, একটা মাথা ইত্যাদি। ইহাই মানুষের একত্ব, এই খানেই মানুষ এক। আবার প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের একটু অমিল ও তফাৎও আছে যাতে করে মানুষের ভিতর পরস্পরকে বেচে নেওয়া যায়। ইহাই, মানুষের বহুত্ব। দেহের ন্যায় মনের চেহারাও মনুষ এক এবং বহু ; বিবেকও মানুষের এক এবং বহু

দয়া, ক্ষমা, দানশীলতা যে ভাল তা সব মানুষই স্বীকার করবে কিন্তু মহম্মদই যে একমাত্র ধর্ম্মগুরু এ হয়ত অনেকেই মানবে না। সকল মানুষের বিবেক ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যে বিশ্বজনীন একতা পাওয়া যাবে সেইটাই সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম; তা ছাড়া আর যা তা ব্যক্তি বা জাতি ধর্ম্ম, সকল মানুষের প্রতিপাল্য সাধারণ ধর্ম্ম বলে তা জোর পূর্ব্বক অপরের উপর প্রয়োগ করতে গেলেই অপরের ব্যক্তিত্বের উপর অযথা জুলুম করা হবে। বাঙ্গালী জাতি আমরা ভাত খেয়ে বেঁচে ও বেড়ে উঠেছি, হঠাৎ যদি কোন পীর সাহেব এসে বলেন—খোরমা খাওয়া ছুন্নত, যেহেতু নবী তা খেয়ে গিয়েছেন, তুমিও খাও সোয়াব পাবে। আমি যদি ভাত ছেড়ে দিয়ে খোরমা খাওয়া আরম্ভ করি তাহ'লে শীগ্‌গিরই অজীর্ণ এসে আমাকে শয্যাশায়ী করবে। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য তার কারণ আর কিছুই নয়—বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালার প্রকৃতিকে মানে আর বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালায় বাস করেও আরব প্রকৃতি পালনই ধর্ম্ম মনে করে; ফলে আসামের কমলা বা শিরাজের আঙ্গুরকে বাঙ্গালার মাটিতে পুতলে যেমন হয় এও তেমনই হয়েছে।

তুমি শ্লেষ্মা প্রধান ধাতের লোক তোমার ঠাণ্ডা সহ্য হবে না, আমি বায়ু প্রধান ধাতের লোক, আমার খুব সহ্য হবে। আমার ঠাণ্ডা সহ্য হবে বলে তোমাকেও যদি তা সওয়াতে যায় তবে তোমাকে মরণের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে নাকি? মহম্মদী ধর্ম্ম যে যায়গায় বলে খৃষ্টানের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে পার, হিন্দুর সঙ্গে পার না, যেহেতু সে পৌত্তলিক। বলতে হবে কেন খৃষ্টানও ত জিসুর পূজা করে, মুসলমানও মহম্মদের পূজা করে। কোন মানুষের মত নির্ব্বিচারে খোদার বলে মেনে নেওয়া যদি একপ্রকার

পৌত্তলিকতা হয় ইসলাম তবে কি? মহম্মদের মত নির্ব্বিচারে খোদার বলে মেনে নেওয়াই নয় কি? মহম্মদকে না মানলে বেহেস্ত যেতে পারবে না, কাবা শরিফ মুখো নামাজ পড়্তে হবে প্রভৃতির চেয়ে জঘন্য পৌত্তলিকতা আর কি হ'তে পারে? মুসলমানের আর এক মুসলমানের জন্য প্রার্থনা করার বিধি আছে, নিখিল মানুষের জন্য নাই। মুসলমানের পয়গম্বর হাসরের দিনে কাঁদছে—হায় উম্মতি! হায় উম্মতি! অর্থাৎ তাদেরই জন্য যারা তাঁকে মানে, তাঁর কথার ইমান রাখে। এর চেয়ে সঙ্কীর্ণতা আর কি হ'তে পারে! মুসলমান মরলে বলতে হয়—ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাহে রাজেউন। হিন্দু মরলে বলতে হয়—ফি নারি জাহান্নামা খালে দিনা। এর চেয়ে malacious uttering (হিংসার উক্তি) আর কি হ'তে পারে?

এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই বলায় কোন গৌরব নেই; কেননা মতের সঙ্গে মিল খেলে সবাই সবাইকে ভালবাসে। কিন্তু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে ভালবাসাতেই ত প্রকৃত মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয়। সম মতাবলম্বীকে ভালবাস্তে হৃদয়ের উচ্চতার দরকার হয় না, বর্ব্বর যে সেও পারে। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে সহ্য করতে একমাত্র উন্নত হৃদয়ের দেব মানুষই পারে। সব চেয়ে বিশ্রী ঠেকে তোমাদের ঐ ইসলাম ইসলাম করে চেঁচানোটাই। যে জিনিষ যথার্থই ভাল তার প্রচারের জন্য বড় বড় propoganda দরকার হয় না। তার প্রচার আপনিই হয়। ভাল সাহিত্যই বল, সঙ্গিতই বল, আর ধর্ম্মই বল মানুষের জন্য যা দরকার মানুষ তা গ্রহণ না করে পারে না। কৌশলে বা জোরপূর্ব্বক কোন জিনিষ কারও গলাধঃকরণ করাতে যাওয়ার মূলে এক পক্ষে কোন না কোন মতলব থাকে, অন্যপক্ষে বিপদ আছে যে গ্রহণ করবে

তার; কেননা তাতে তার বদ্‌হজম হয়। স্ব ইচ্ছায় রুচির সঙ্গে বিষ পান করলে যে ক্ষতি না করে অনিচ্ছায় অমৃত পান করলে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করে। প্রকৃতির ইহাই চিরন্তন অপরিহার্য্য নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম যেখানেই, ফল সেখানে কিছুতেই শুভ নয়। যে কোন শাস্ত্রশাসিত সমাজের অবস্থাই মঙ্গলপ্রদ নয়। ইউরোপ যে এত বড় হ'য়েছে সে কেবল শাস্ত্র-গণ্ডির বাইরে এসে। রুষ ও তুর্কী বেঁচেছে শাস্ত্রকে অমান্য ক'রে। বাঙ্গালী হিন্দুও ততখানি উন্নত যত খানি সে শাস্ত্রের গণ্ডীর বাইরে। জগত জুড়ে এই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান চলেছে। তুমি বলবে কোরাণ খোদার বাণী, শাস্ত্র নয়; সে হিসেবে প্রত্যেক শাস্ত্রই খোদার বাণী। খোদা আজ প্রথম আবিষ্কৃত হয় নি, অনেক কাল পূর্ব্বেই হয়েছে আর সেই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মতও অকাট্য সত্য বলে তার নামে আবিষ্কৃত হয়েছে; আবার তা লয় পেয়েছে বুদ্‌বুদের মত। মানি, সত্য প্রচারের অধিকার সবারই আছে কিন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণ করে, স্তুতিবাদ ক'রে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ হাছিল হতে পারে, তা ছাড়া আর কিছু হয় না। মানুষের মন দুদিনেই সে ফাঁকি ধ'রে ফেলে নিজের পথ খুঁজে নেয়। তুমি বলবে ইসলাম চিরন্তন সত্য—বিশ্বমানবের ধর্ম্ম। বেশ, তাই যদি হয় সত্যের নামেই মানুষকে সংস্কার কর না—ইসলাম বা মহম্মদের নামে কেন? বিশ্ব মানবের ধর্ম্মই যদি ইসলাম হয় মানুষকে মানুষ না বলে মুসলমানকে বলবে কেন? মুসলমান বলার মানেই হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতির থেকে পৃথক করা। হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতি তারাই যারা মহম্মদকে মানে না। একথা কিছুতেই বলা যায় না হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতির ভিতর সত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নাই. কিন্তু তাকে ত মুসলমান বলতে শুনিনি যতক্ষণ

না সে নবীর কলমা পড়ে পাপ না করেও তোওবা পড়ছে! শুন্‌তে পাই ইসলাম স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। কোন জায়গায় দেখি না ত! পুরুষ চার বিয়ে করতে পারে, স্ত্রী পারে না। স্ত্রী অপছন্দ হ'লে পুরুষ তাঁকে তালাক দিতে পারে, স্ত্রী পুরুষকে পারে না ইহারই নাম কি সমান অধিকার? পর্দ্দা প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তনাকে আমি নিন্দে করিনে। সে যুগের সেই সমাজের অবস্থায় হয়ত ঐটাই দরকার হয়েছিল, কিন্তু সেই যুগের সেই উৎকর্ষলেশহীন আরব সমাজ আর বর্ত্তমান যুগের এই সুনিয়ন্ত্রিত সুশাসিত সুসভ্য মানুষের সমাজ কি এক? আধুনিক সমাজে হয়ত তেমন উৎকর্ষলেশহীন অসভ্য পশুমানুষ দু' একজন আছে কিন্তু সেই দু' একজনের খাতিরে সমগ্র মানব জাতিকে ব্যর্থ করে দিয়ে মানব প্রকৃতিকে অবমাননা করার কার কী অধিকার আছে?

পর্দ্দা প্রথার মূলে রয়েছে একদিকে স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস অন্যদিকে পুরুষ প্রকৃতির প্রতি একটা কদর্য্য মনোভাব। কিন্তু সেটা কি ঠিক? সৃষ্টিকর্ত্তা কি এমনই পাগল যে না জেনে শুনে মানুষকে যা তা একটা গড়ে দিয়েছেন! সত্য মঙ্গলের প্রতি যদি মানুষের একটা স্বাভাবিক আসক্তি না থাকে তবে কি তুমি ইচ্ছে করলেই তাকে সত্য মঙ্গলময় করে তুল্‌তে পার? তোমার ইচ্ছামতই কি সৃষ্টি? মানি, উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্বাধীনতার মানে ত উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা বরং উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী। স্বাধীনতা মানুষের স্বাভাবিক মঙ্গলময় সত্বার পূর্ণ পরিচালনা কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা বল্‌তে মানুষের মন্দ ও অসৎ সত্বার পরিচালনা বুঝায়! এই মঙ্গলময় সত্বার খাতিরে মানুষের মন্দ স্বভাবকে যতটা পারা যায় শাসন করতে হবে

কিন্তু মন্দ স্বভাবকে নির্ম্মূল করতে ভালটাকে ত কোন প্রকারে খাটো করা যায় না। পথ চল্‌তে বিপদ আছে তাই বলে কি পথ চলা বন্ধ করে দিতে হবে? বেঁচে থাকলে পাপ করতে হয় তাই বলে কি আজই মরব? 'জীবন যে অমূল্য দান, এর যতটুকু পেয়েছি ব্যর্থ করে দিয়ে নিষ্ক্রিয় মৃত্যুাবস্থা কেন বরণ করে নেব? তার চেয়ে স্বাধীনতার সঙ্গে যদি একটু উচ্ছৃঙ্খলা আসে আস্‌তে দাও। মানুষ যে খাদ্য খায় তার সব কিছুই কাজে লাগে না, অসারাংশ রূপে অনেক কিছুই বাদ যায়। একেবারে নির্ম্মল পরিশ্রুত জল যদি নাই মেলে মানুষ কি আদৌও জল পান করবে না? সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত নির্ম্মল পৃথিবীতে কিছুই নেই। জগতটাই ভাল-মন্দেই মেশা। মন্দকে একেবারে তাড়াবে কি করে? মন্দেরও যে একটা শক্তি ও সার্থকতা আছে, সেটা অস্বীকার করলে তোমার ভালরও যে কোন দাম থাকে না।

পর্দ্দার মূলে রয়েছে অবিশ্বাস—মাকে, বোনকে, স্ত্রীকে অবিশ্বাস। অবিশ্বাস মানেই অবমাননা, অসম্মান। সতীত্বের খুব দাম মানি কিন্তু যে সতীত্বকে সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচিয়ে বেঁধে পাহারা দিয়ে রাখ্‌তে হয় তার কি দাম? সতীত্বের মালিক কে? যার সতীত্ব সে, না তুমি? সতীত্ব মানে কি নিরাপদে ও নির্ঝঞ্ঝাটে অপরের ভোগ্য হওয়ার অবস্থা? স্ত্রীলোক কি তোমার ভোগেরই সামগ্রী মাত্র? তার নিজের কি কোন চাওয়া নেই? তুমি যেমন তাকে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন ও বিপদ আশঙ্কার হাত থেকে বাঁচিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে চাও সেও কি তোমাকে তেমন করেই চায় না? সতীত্বের দরকার তার, তোমার নেই?

মুসলমানের আর একটা বড়াইয়ের কথা শুনতে পাই,—সব শাস্ত্রেরই

কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে তাদের কোরাণ কিন্তু যা তাই আছে। এতে কিন্তু আমি গৌরবের কথা কিছুই দেখতে পায় নে. পরিবর্ত্তন যার নেই সে মরা। জীয়ন্ত জগতে সব কিছুরই পরিবর্ত্তন আছে। পরিবর্ত্তন স্বভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ম। পরিবর্ত্তন বিনা যে কোন প্রকারের উন্নতি একেবারে অসম্ভব কোরাণ খোদার বাণী—খোদার বাণী অভ্রান্ত সুতরাং তার পরিবর্ত্তন নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে যা খোদার নয়? সব জিনিষই খোদার, সব জিনিষেরই পরিবর্ত্তন আছে। সব জিনিষই একবার ক'রে জন্মগ্রহণ ক'রে নানা ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে গিয়ে মৃত্যুর বুকে ঢুলে পড়ে। ধ্বংস এবং মৃত্যু মানুষের মনে খুব বেদনাদায়ক মানি—এতকাল যে ছিল আজ তাকে হারাতে হবে জান্‌লে পরাণ আতঙ্কে শিউরে উঠে কিন্তু উপায় নেই। একহাতে কবর খোঁচা অন্য হাতে চোখের জল মুছা এ মানুষকে করতেই হবে। এতে মমতা করলে, কৃপণতা করলে যে গিয়েছে সেত গিয়েছেই পরিণামে তোমাকে শুদ্ধ নেবে। কোরাণে আর কিছু আছে বা না আছে আমি জানিনে। কিন্তু কোরাণের যেটুকু নিয়ে সমাজ আজ গোল্লায় যেতে বসেছে, দুনিয়ার দ্বারে নিঃস্ব, ভিখারী, দীন, কাঙ্গাল হয়ে পড়ছে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রোধ ক'রে দিয়ে দিব্য আরামে ঘুমুচ্ছে সেইটাই আমার এখানকার আলোচনার বিষয়। তা ছাড়া কোরাণের যে শিক্ষা কোরাণেই রয়ে গিয়েছে—সমাজ যা নেয় নি, কাজে লাগায় নি, আজ তেরশ বছর পরও বিলাতী মিলের প্রতিযোগিতায় গান্ধির চরকার মত যা একঘ'রে অকেজো হয়েই রইল, সমাজ জীবনে খাট্‌ল না, কাজে এল না, মানুষের জন্য সমাজের জন্য তা আর জানারও দরকার আছে ব'লে আমি মানিনে।

তার চেয়ে যা অনিবার্য্য অবশ্যম্ভাবী তাকে আর বাধা না দিয়ে পথ

ক'রে দাও। সে আসুক, আমাদের সকল গ্লানি, ময়লা ও জঞ্জাল ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে বর্ত্তমান দুনিয়ায় খাপ খাওয়ান নূতন সাজ ও পোষাক দিয়ে যাক। কোরাণকে নিয়ে একসময় মুসলমান সমাজ খুবই উন্নত হয়েছিল, শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞান ও সভ্যতায় একসময় দুনিয়ায় সকল জাতিরই অগ্রণী হয়েছিল কিন্তু সেদিন গেছে; একই জিনিষ একজনের পক্ষে চিরকাল কিছু সমান দরকারী থাকে না। মাতৃদুগ্ধ এক সময় শিশুর খুব উপাদেয় খাদ্য ছিল, কালে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তা আবার তার অখাদ্য হয়ে গেল কেন?

এই বিশ্বপ্রকৃতিই মানুষের এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ যে পড়্‌তে পারে তার বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতির দরকার হয় না। বড় পেলে কি কেউ ছোটকে চায়? অফুরন্ত অসীমকে পেলে কি কেউ ফুরন্ত সসীমে তৃপ্ত হয়, স্বাধীন হ'লে পারলে কি কেউ পরাধীন হয়ে থাক্‌তে চায়—মূল পেলে কি কেউ শাখাকে আশ্রয় করে?

শুন্‌তে পাই কোরাণের ভিতর সবই আছে। যদি তাই হয় তবে কোরাণের ছাত্রেরাই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী নয় কেন? জ্ঞান রাজ্যে তারা আজ অত নগণ্য কেন?

মোট কথা—ধর্ম্মের চিরআশ্রয়স্থল মানুষের যে প্রাণ মুক্ত থাক্‌লে বিচিত্র দুনিয়ার নানা অভিনব ভাবের আনাগোনায় উত্তরোত্তর উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে শাস্ত্রের কৃত্রিম বিধি নিষেধ সেখানে আজ অতি নিষ্ঠুর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাস্ত্র মানুষকে তার নিজস্ব স্বভাব থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন ক'রে গণ্ডীবদ্ধ করে দিয়ে তার পচনশীলতা অত সহজ ক'রে তুলেছে। তাই আজ দেখ্‌তে পাই দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা, মিথ্যাচার ও পাপ এই শাস্ত্রীয় পাণ্ডাদের ভিতরই বেশী। আদালত এরাই

চালায়, জেলখানায় এরাই খাটে। সাওতাল প্রভৃতি বুনো জাত যাদের শাস্ত্র বলে কিছুই নেই অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যথেষ্ট থাকলেও স্বভাবের কোলে পালিত বলে সত্যনিষ্ঠায় ও চরিত্রের মহনীয়তায় আমাদের শাস্ত্রীয় সভ্য সমাজের চেয়ে তারা অনেক বড়। সকল প্রকার fellow feeling কে বিদায় দিয়ে তারা হৃদয়টাকে মরুভূমির মত শুষ্ক নির্ম্মম ক'রে তুলে নি। যেখানে বাধা ভয় ও সঙ্কীর্ণতা সেইখানেই বিশৃঙ্খলতা, বিদ্রোহ পাপ এবং কলুষতা। যেখানে অবাধা ও স্বচ্ছন্দতা সেইখানেই মুক্তি শান্তি ও পবিত্রতা।

সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানের একটা tendency (প্রবণতা) দেখ্‌তে পাই—নিজেদের সমাজের ও ধর্ম্মের অনেক গ্লানি উপলব্ধি কর্‌তে পেরেও তারা তা স্বীকার করতে নারাজ। কারণ অনেকটা তাদের মূর্খ অহঙ্কারের ভিতর। তাদের ধর্ম্মকে এতদিন তারা চিরকালের জন্য নিখুঁত বলে বড়াই করে এসেছে আজ যদি হঠাৎ দোষ স্বীকার ক'রে ফেলে তবে সে বড়াইয়ের কোন মানে থাকে না। মতের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ হয়ে পড়ে। যেন সত্যকে ঠেকিয়ে রাখলেই রাখা যায়। সত্য মিথ্যার মালিক যেন সেই। এ একেবারে মূর্খতা, পরের কাছে উপহাসাস্পদ হওয়ার ভয়ে নিজের ভুল ও কদাচারের পরে দরদ দেখান যে আত্মহত্যারই নামান্তর তা তারা বুঝে না। পরের মুখ চেয়ে চলার চেয়ে, পরের নিন্দা ও প্রসংশার মোহে নিজেকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেয়ে নিজেকে সংস্কার করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেই মান থাকে। মানুষের বর্ত্তমানের দাম যত অতীতের দাম বাস্তব ক্ষেত্রে গণনায় তত আসে না। শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সার্থকতার কাছে সকলে সত্যি করে নত হয়।

আমজেদ অবাক হইয়া শুনিতেছিল, লক্ষ্য করিতেছিল তাহার বলিবার ভঙ্গিমাটা আর ভাবিতেছিল ধর্ম্মের উপর এতটা বিদ্রোহ এ পেলে কোথায়? তাহার অন্তরের বিশ্বাস নড়িয়া উঠিবার মত হইয়াছিল। সহসা সচেতন হইয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—দেখ আকবর, তোমাকে একটা suggestion (যুক্তি) দিই, ইসলামিক রিভিউ (Islamic Review) টা একবার পড় তাহ্লেই বুঝ্বে ইসলাম কি। ইউরোপের কত মহা মহা মনীষী ইসলামের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামকে সাদরে বরণ করে নিচ্চে।

—নিচ্ছে সত্যি, আবার পাদ্রীদের কনভারশন রেজিষ্টার খুলে দেখ, কত মহা মহা ঋষি খৃষ্টানত্বও কবুল ক'রে নিচ্ছে। নব্য আর্য্য সমাজীরাও কত ভাল ভাল মুসলমানকে convert (দীক্ষিত) করেছে। যারা ধর্ম্মান্তব গ্রহণ করে তারা মনীষীই অথবা ঋষিই হউন তাদের একটাকেও আমি মানুষ বলিনে। তারা ভাল খৃষ্টান হ'তে পারেন, ভাল মুসলমান হ'তে পারেন কিন্তু মানুষ তারা কিছুতেই নয়। মানুষ যে, বীর যে, সমাজের মিথ্যা ও কুসংস্কারকে বর্জ্জন করতে পারে কিন্তু সমাজকে সেই অজুহাতে বর্জ্জন করলে তার মনুষ্যত্ব থাকে না। জীবন সংগ্রামের জন্য, মিথ্যাকে, কুসংস্কারকে যে ভয় ক'রে দূরে পালায়, সহস্রকে ত্যাগ ক'রে যে নিজের সুখ সুবিধা ও মুক্তি খুঁজে সে ত কাপুরুষ, সে ত হীন, দুর্ব্বল স্বার্থপর! আদর্শ মানব সে ত নয়। আদর্শ মানব সেই যে সমাজের মিথ্যা ও কুসংস্কারকে যুদ্ধ দেওয়ার জন্য বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ভয় ক'রে দূরে পালায় না।

—আচ্ছা কনভারশনের কথা ছেড়ে দাও। জগতের কত মহা মহা মনীষী কোরাণ সম্বন্ধে কি বলে গিয়েছেন তা তোমার জানা আছে?

—আমার তা জানার দরকার ? পরের চোখে দেখা পরের কাণে শানা ও পরের মুখে পরখ করার অভ্যাস তোমাদের থাকতে পারে আমার কিন্তু নেই। গিরিষ সেন আর German Philosopher Goethe কি বলেছেন তা আমাকে মেনে নিতে হবে, কেন ? বিধাতা আমার যে দুটো চোখ, কাণ ও জিভ দিয়েছেন সে কি বাজে, মিথ্যে ?

কোরাণ সম্বন্ধে একটু স্তুতিবাদ করে যদি নিজের কোন বড় স্বার্থ হাছিল হয়, মুহূর্ত্তে কোটী কোটী কপি কোরাণের অনুবাদ বিকিয়ে যায় তবে গিরিষ সেন তা করবেন না কেন ? গিরিষ সেনের বুদ্ধিকে আমি নিন্দে করিনে কিন্তু তোমাদের যুক্তি দেখ্‌লে আমার হাসি পায়। কোরাণের ভেতর যে যতই deep philosophy (সূক্ষ্ম দার্শণিক তত্ত্ব) দেখুক আমি কিন্তু দেখি ওতে আছে কতকগুলা—"মহম্মদ ইয়া রসুলোল্লা" আছে কতকগুলা মহম্মদের self-advertisement (আত্ম-প্রচার)

—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি কোথা থেকে জান ?

—জানি।

--কোথা থেকে ?

—খৃষ্ট ধর্ম্ম থেকে, তোমাদের ইসলাম যার 'কপি' (নকল)।

কোরাণ বাইবেলের "কপি" ?

—নিশ্চয় ! বাইবেলে যে আদম হাওয়া ও পীর পয়গম্বরের কাহিণী কোরাণেও তাই। তফাতের মধ্যে খৃষ্টানেরা যে যায়গায় জিসুকে খোদার বরপুত্র ব'লে মানে মুসলমানেরা সে জায়গায় মহম্মদকে খোদার পয়গম্বর ব'লে মানে। বাইবেলের খোদা জিসুর ধামা ধরা—কোরাণের খোদা মহম্মদের ধামা ধরা, একই কথা ; একই জিনিষের ওপিঠ ওপিঠ।

– দেখ, ধর্ম্ম শাস্ত্রকে অমন ঠাট্টা করা তোমার উচিত না। দুনিয়ায়

কোটী কোটী লোক যাকে মানে তাকে তুমি না মানতে পার অন্ততঃ একটু সম্মান করা উচিত।

—ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঠাট্টা করলেই যথেষ্ট করা হয় না, ওগুলোকে একদম পুড়িয়ে ফেলার দরকার। দুনিয়াকে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ভাগে ভাগ ক'রে প্রকৃতির দেওয়া মনপ্রাণ নির্ম্মম ভাবে পিষে মেরে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়েছে কে বল্‌তে পারে? ইহকালের মহত্ব থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষকে ভূয়ো পরকাল লোভী স্বার্থপর পশু ক'রে তুলেছে কে বল্‌তে পার, মানুষের মনপ্রাণের বিকাশ রোধ ক'রে দিয়ে অনাচার অত্যাচারে পোষ মানা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ক'রে তুলেছে কে বল্‌তে পার? কে, তোমাদের শাস্ত্র ছাড়া?

—ইউরোপীয় খৃষ্টানদের শাস্ত্র এক, তারা বুঝি পরস্পরকে খুব ভালবাসে? মহাযুদ্ধের কথা মনে কর ত! সাওতালদের শাস্ত্র নেই তারা বুঝি খুব স্বাধীন?

আকবর উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেল। আমজেদ ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল আচ্ছা, আজ ঐ পর্য্যন্ত থাক, আর একদিন দেখা যাবে। বেলা হয়ে গেছে। গোছল করা যাক। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আকবর ও ক্ষান্ত দিয়া স্নান করিতে উদ্যোগী হইল।

—কি লিখছি শুন্‌বে ?

—বিষয়টা বল।

—ধর্ম্ম ও সমাজ ?

—না ভাই ও সব দার্শণিক তত্ত্বে আর রুচি নেই, বরং একটা কবিতা বল—লেখনি কিছু এর মধ্যে ?

—কবিতা লেখার আর অবসর কই ? সেকেলে পূরানো যা আছে।

—তবে একটা গান বল, সেই যে, 'কি হয় তোমার ও মুখখানি, আরবার দেখালে' তোমার গানের নায়িকা ও বোধ হয় এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে আছে।

আকবর একটু বিস্মিত হইয়া আমজাদের মুখের দিকে চাহিল। আমজাদ কহিল—তুমি মনে করছ আমি কিছু লক্ষ্য করিনে। তোমার একালের যতগুলি কবিতা তা ঐ মেয়েটাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা, স্বীকার কর কিনা।

স্বাকারের ছলে আকবর একটু হাসিল ও কহিল—বাস্তবিক মেয়েটাকে আমার বড় ভাল লাগে। আমার মনে হয় Words worth এর Phantom of Delight (ফ্যানটম অব ডিলাইট) যেন ওকে লক্ষ্য করেই লেখা।

—ও কিন্তু কোন জমিদারের মেয়ে, জমিদারদের পরে ত তোমার কোন শ্রদ্ধা নেই !

—জমিদারী প্রথার পরে আমার শ্রদ্ধা নেই কিন্তু কোন ব্যক্তিগত

জমিদার বা জমিদারের মেয়ের পরে আমার শ্রদ্ধা বা ভালবাসা থাকৃতে পারে না একথা আমি কোন দিনই বলিনি।

—কিন্তু যা'দিগকে তুমি চোর বা ডাকাত মনে কর তা দিগকে তুমি কি ক'রে ভালবাসৃতে পার?

—কিন্তু তারা যে চোর বা ডাকাত সে সম্বন্ধে হয়ত তারা অজ্ঞ বা সজ্ঞান হলেও হয়ত তারা তা স্বীকার করবে না, সে অবস্থায় কি ক'রে তা'দিগকে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করতে পারি। অজ্ঞতা বা মতানৈক্যের জন্য কি কেউ ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার পাত্র হ'তে পারে?

—সে ঠিক, আচ্ছা গাও ঐ গানটা 'কি হয় তোমার ও মুখখানি আরবার দেখালে'?

আকবর কহিল—ওটা না, একটা রবীবাবুর গান নাই।

—আচ্ছা গাও যেটা তোমার ইচ্ছে।

আকবর গাহিতে লাগিল—জীবনে কত কাজ হ'ল না সারা, জানিহে জানি তাও হয়নি হারা। যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।

খানিক পরেই মেয়েটা বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, আমজাদ তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাস্তবিকই ও একটা Phantom of delight, ওকে দেখ্‌লেই তোমার সেই কবিতার ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছে হয়—কাব্য আমার হারিয়ে গেছে তোমার রূপের ও গঙ্গায়।

এমন সময় মেসের ম্যানেজার আসিয়া কহিল—আকবর সাহেব আজ আপনার পালা, বাজার ক'রে আসুন।

আকবর উত্তরে কহিল—বাবুর্চ্চিকে দিয়ে বাজার করালে হয় না?

—বাবুর্চ্চি চুরি করে।

—তা গরীব মানুষ, যদি দু'পয়সা বাজার করার থেকে পায়, তাতে আপত্তি করেন কেন ?

—বা! চুরি করবে তাই সহ্য করতে হবে ?

—চুরি যাতে না করে তার ব্যবস্থা করলেই ত পারেন!

—কি ক'রে ?

—পেট ভ'রে মাইনে দিলেই আর করে না।

—কিন্তু দশ টাকার মাইনের জন্য কত গ্রাজুয়েট আজকাল লালায়িত, তা জানেন ?

—জানি, কিন্তু পাচ'শ টাকা পেলেও কোন গ্রাজুয়েট সন্তুষ্ট নয় তাও জানি। সুযোগ পেলে চুরি করতে ও কেউ কসুর করে না।

—আপনি তবে dishonestyর (অসাধুতা) প্রশ্রয় দিতে চান ?

—প্রশ্রয় দিই, চাই না দিই, আজকালকের দুনিয়ার কেউ honest (সৎ) না, আমি মাত্র সেই কথাই বলছি। আপনি যে গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করেন সে কি খুব honest ? নিরন্ন সহস্র প্রজার দুঃখ হাহাকারের ভিত্তিতেই কি তার সমৃদ্ধির রজত সিংহাসন তৈয়ারী না ? ক্লাইভ যে রাজ্য জয় করেছিল সে কি খুব honestyর সঙ্গে ? আজকাল honesty (সততা) মানেই খেতে না পাওয়া, সারা বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ভূঁইয়ের ফসল রাজা, জমীদার মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে বাড়ি এসে স্ত্রী পুত্র নিয়ে উপোস থাকা। ঐ দেখুন, তার নমুনা—সারা জীবন ইট বয়ে বয়ে বেচারীরা কোনদিন কোটা ঘরে বাস করতে পারলে না।

জানালার ফাঁক দিয়া একটু দূরে একখানা চারিতলা বাড়ী তৈয়ারি হইতেছে দেখা যাইতেছিল।

—আপনি তবে বাজার করবেন না ?

—আমার এখন কাজ আছে।

—আপনার meal (খাবার) তাহ'লে বন্ধ।

—আচ্ছা, করুন গে বন্ধ।

সন্ধ্যায় এক মিটিং বসিল। আকবরকে মেসে থাকিতে দেওয়া হইবে না, এই মতলবে। আকবর ব্যতীত মিটিংএ অন্য সকলেই উপস্থিত ছিল। মেসের জনৈক মেম্বর সাহেব প্রস্তাব করিলেন—আকবর নামে মেসের জনৈক মেম্বরের বিপ্লব ও নাস্তিকতা মূলক ক্রিয়া কলাপের জন্য এবং মেসের জনসাধারণকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার হিতে এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে তাহাকে অবিলম্বে মেস ছাড়িয়া যাইবার জন্য নোটিশ দেওয়া হউক।

আমজেদ প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—দেখুন, নাস্তিক বা বিপ্লববাদী হইলেও সে আমাদের সমাজেরই লোক—সমাজের মঙ্গলই যখন তার কামনা তখন তাকে এই ভাবে বয়কট করা বুদ্ধিমানতা ও ভদ্রতার কাজ হবে না। সে ভ্রান্ত হ'তে পারে সেজন্য আপনারা তাকে উপেক্ষা করতে পারেন।

আপনি উপেক্ষা ক'রে চল্‌তে পারেন, আমরা পারিনে। গভর্ণমেণ্ট যদি জান্‌তে পারে আমরা একজন বিপ্লববাদী নিয়ে বাস করছি, আমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখুন ত।

—আমার ভায়া আছে। আপনারা তার সঙ্গে এক মেসে থেকে ভয় করছেন কিন্তু সে আমার আশৈশবের বন্ধু, তবু আমি তাকে ভয় করিনে।

—আপনার বন্ধু বলে আপনি ভয় না করতে পারেন, আমরা কিন্তু

না ক'রে পারিনে। প্রস্তাব দুইটী ভোটে উঠিল। আমজাদ হারিয়া গেল। প্রথম প্রস্তাব কয়েক ভোটে জিতিয়া যথা সময়ে বোর্ডে উঠিল।

মিটিং শেষে কেউ নামাজ পড়িতে মসজিদে, কেউ পান ও সিগারেট খাইতে বাহিরে গেল।

আকবর সে সময় নিজের সিটে বসিয়া লিখিতেছিল। তাহাকে ছাড়া আর সকলকেই যখন মিটিংএ ডাকা হইয়াছিল সে বুঝিয়াছিল তাহারই বিরুদ্ধে একটা কিছু হইতে যাইতেছে। সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া লিখিতেছিল। হঠাৎ আজানের শব্দে চিন্তায় বাধা পাইয়া বলিয়া উঠিল—উঃ! কী বিশ্রী চিৎকার বাবা!

জনৈক মেম্বর তখন মিটিং শেষে বাহির হইতে পান সিগার খাইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। আজানের শব্দে বিরক্ত হইতে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—

—আজান আপনার কাছে বিশ্রী ঠেকে, আকবর সাহেব?

—ঠেক্‌লে আর কি করব ভাই? কাণ দু'টো ত আর আমার তৈয়েরি না!

—কাণ শুধু আপনারই আছে না আর কারও আছে?

—আমার যে দুটো কাণ তা আমারই, আর কারও নেই।

—ও! এই কথা, আপনি বোর্ডে নোটিশ খানা দেখেছেন?

—নোটিশ দেখবার আমার অবসর কৈ?

—কিন্তু একবার দয়া করে দেখে আসুন না।

—আমার সময় হ'লে আমি দেখ্‌ব, আপনাকে অনুরোধ করতে হবে না।

—আপনার সময় এখনই হতে হবে, এই মুহূর্ত্তেই আপনাকে এ মেস ছেড়ে যেতে হবে।

'—মেস্‌টাকে কি আপনি আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছেন ?

—তুমি বাপ তুলে কথা কইবার কে হে ?

—তুমি মেস থেকে চলে যেতে বলবার কে হে ?

চিৎকার শুনিয়া অন্য যে যেখানে ছিল দৌড়াইয়া আসিল। তাহাদের দেখিয়া মেম্বর সাহেবটী কহিলেন—আজানকে ও বলে কিনা বিশ্রী গাধার চিৎকার।

সকলে একযোগে কহিল—না আকবর সাহেব, এ আপনার ভারি বাড়াবাড়ি হচ্ছে, আপনি যেন নিজেকে সেই মোগল যুগের আকবর মনে করেন। কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত এটা মোগল যুগও নয় বা আপনি আকবর বাদসাহ ও নন।

—আকবর বাদসা বাদসা হয়েও কিন্তু তার অধীনস্থ বিরুদ্ধবাদীদের উপর এমন চড়াও হন নি।

—সে যা হ'ক, আপনি দয়া ক'রে নোটিশটা দেখে আসুন।

—নোটিশ দেখার আমার অবসর নেই, আপনারাই ভাল ক'রে দেখুন গে।

—আপনি তাহ'লে যাবেন না ?

—যাব না কেন, নিশ্চয় যাব, আপনারা না তাড়ালে আর যাচ্ছি কোথায় ?

—আপনাকে আবার কি ক'রে তাড়াতে হবে, গলা ধাক্কা দিয়ে ?

—হ্যা তাই,

—কেন, আমাদের গলাধাক্কা আপনার অত লোভনীয় হ'ল কি ক'রে

—লোভনীয় নয়! গলাধাক্কা খেয়েই ত জগতের যত বড়লোক অমর হয়ে গিয়েছেন, গ্যালিলিও, সক্রেটিস, জিসু, মহম্মদ কে না?

—অর্থাৎ বল্‌তে চান উনিও একজন জিসু মহম্মদ, হায়রে দুরাশা! সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমজাদ সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে তাহার সারা অন্তর আকবরের উপর বিষাইয়া উঠিয়াছিল। জনতাকে সে হাত জোড় করিয়া কহিল—আপনারা এখন যান, আমি কালই ওকে স্থানান্তরে পাঠাচ্ছি। সকলে চলিয়া গেলে আমজাদ আকবরকে কহিল—তুমি কিছুদিনের জন্য বাড়ি যাও। আমার ফল না বেরোনো পর্য্যন্ত আমাকে এখানেই থাক্‌তে হবে।

—ফল বেরোলে যদি পাশ করি খবর দেব, এসে দেখা ক'র।

আকবর রাজী হইল। কিন্তু মনে মনে একটু বিস্মিত ও ব্যথিত হইল। সে ত ইচ্ছা করিয়াই এখানে ছিল না। আমজাদের অনুরোধেই ছিল। কোন দুঃসময়ে আমজাদ যে তাহাকে অমন বিনয়ের সঙ্গে ত্যাগ করিতে পারে তাহা সে পূর্ব্বে আশা করে নাই। সে বুঝিল—দুনিয়াই-স্বার্থপর, আত্মীয় বল, বন্ধু বল কেউ বিনা লাভে কারও জন্য ঝঞ্ঝাট বা অসুবিধা পোহাইতে রাজী নয়।

—o—

হোষ্টেল হইতে বহিস্কৃত হইয়া আকবর মহা সমস্যায় পড়িল। বাড়ী যাইবে সে কোন মুখে? উপায়হীন অকর্ম্মণ্য কি কাহারও প্রীতির পাত্র হইতে পারে? তবে? না. চাকুরীটা প্রত্যাখ্যান করিয়া সে নিশ্চয় ভাল করে নাই। আজ যদি সে না খাইয়া মরে কেহ কি তাহার খোঁজ লইবে? সে সত্য মঙ্গলময় নিষ্কাম আদর্শ জীবন যাপন করিতে যায় সত্য, কিন্তু যতদিন সে জীবনের সন্ধান না পাইতেছে ততদিন ত তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আবার মনে হইল—আত্মরক্ষা বড় ধর্ম্ম কিন্তু আত্মোৎসর্গও ত কম বড় ধর্ম্ম নয়। স্বার্থের চেয়ে মনুষ্যত্বের ত্যাগধর্ম্ম কি আরও মোহনীয় নয়? সার ফিলিপ সিড্‌নির কথা তাহার মনে পড়িল। তৃষ্ণাতুর মুমূর্ষু প্রাণের সেই মহান আত্মত্যাগ—কি অনুপম স্বর্গীয় সেই ভাব! সে কি ঐ আদর্শ হইতে 'বিচ্যুত হইতে পারে? আজ যদি সে মরে. সে মরণ কি তবে ঐ সিড্‌নির মৃত্যুর মতই আত্মোৎসর্গের গৌরবময় মৃত্যু হইবে না? জগত না মানুক, ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় অমৃত অক্ষরে লেখা না থাকুক তবু সে ত গৌরব! মানব প্রাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহত্তম অভিব্যক্তি—সৃষ্টির যথার্থ সার্থকতা!

আকবর ঠিক করিল—সে যদি কোন স্কুল-মাষ্টারি খুঁজিয়া না পায় তবে নিশ্চয় মজুরের কাজ লইবে। তাহাতে যদি সে অপারগ হয় মরণের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে সে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবে না।

বইখানা আজও শেষ হয় নাই যে তাহা লইয়া সে প্রকাশকদের দ্বারে যাইবে। সঙ্গে মাত্র ছিল দুইটা টাকা, তাহাই ভাঙ্গাইয়া খাইয়া ও

সিয়ালদহ ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া কয়েকদিন অবিশ্রান্ত ঘুরাঘুরি ও চেষ্টার পর মাসিক ২০৲ টাকা মাহিনায় একটী প্রাইভেট টিউশনি পাইল। তাহাই অবলম্বন করিয়া দিনরাত প্রাণপণ পরিশ্রমে বইখানি শেষ করিতে চেষ্টা পাইল। প্রাইভেট ছাত্র দুইটী সঙ্গে লইয়া একদিন গড়ের মাঠ হইতে ঘুরিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে হঠাৎ আমজাদের সহিত তাহার দেখা হইল। আমজেদ তাহাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া কহিল—বাড়ী যাও নি যে! কোথায় আছ? আকবর টিউশনির কথা বলিল।

—তোমার একখানা চিঠি আছে। বলিয়াই জামার পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। আকবর পড়িয়া দেখিল—চিঠিখানি তাহার পিতার লেখা, তাহাকে অবশ্য অবশ্য বাড়ী যাইতে লিখিয়াছেন। আকবর কালবিলম্ব না করিয়া কিছুদিনের ছুটী লইয়া বাড়ী রওনা হইল।

বাড়ী পৌছিলে পিতা ও মাতা তাহাকে আজিও বেকার জানিয়া বাড়ী থাকিয়া যাহা হউক কিছু করিতে বলিলেন। কিছু পুঁজি দিয়া মুদির দোকান করিয়া দিতে চাহিলে আকবর তাহাতেই রাজী হইল। চাকরের সাহায্যে খরিদ্দার আসিলে তৈল, লবণ প্রভৃতি ওজন করিয়া মাপিয়া দিতে পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে।

দোকান আরম্ভ করিয়াই আকবর মায়ের ইচ্ছায় ও বাপের অনুমতিতে বধূকে প্রথম লগ্ন করিয়া লইয়া আসিল! আনিয়াই তাহার সম্বন্ধে কবিতা লিখিল—

"আজ সকালের সদ্য ফোটা গন্ধে লোটা ফুল,
সুন্দরী গো, কাহার তুমি কোন অতুলের তুল?

* * *

সুন্দরী গো, লও আশীর্ব্বাদ, আমার প্রাণের সবখানি বিলকুল।

'এ সেই তাহার অবজ্ঞাত কুরূপা স্ত্রী। প্রণয়ের ছোওয়া পাইয়া যৌবনের উদ্দীপনায় সে আজ অমনি হইয়াছে কবিতা শুনিয়া বধূ মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করিল। স্বামীর কবিত্ব শক্তির পরিচয়ে ততটা নয় যতটা তাহার নিজের সম্বন্ধে তারিফ শুনিয়াই। প্রাণের সবখানি এইরূপে বধূকে বিলাইয়া দিয়া আকবর তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইল। স্বামী বি,এ পর্য্যন্ত পড়িয়া মুদীর দোকানের দোকানদার সে তবে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া আবার কি হইবে .বধূ ভাবিয়া পাইল না। তবু সে পড়িতে লাগিল—স্বামীর প্রেরণায় কিন্তু খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে নয়।

তিন মাস পরে বধূ যখন পিত্রালয়ে ফেরৎ গেল ,বিরহ বেদনার আতিশয্যে আকবর কবিতায় লিখিল—

"যবে এলে, সাগরের জল শীকর হাতে দখিণ হাওয়া
দুয়ার পাশে দেখ্‌তে এল,
যবে গেলে, এলো মেলো ঝাপটা দোলায় ঝড়ো হাওয়া
ঘরের প্রদীপ নিবিয়ে গেল।

* * *

সারা দুনিয়ার সেরা সম্পদ প্রাণের মনিব প্রেয়সী আমার গো,
সান্ত্বনা ছলে দুটী অক্ষরে আঁখিজলে লিখে একখানি চিঠি দিও।

অন্য একদিন লিখিল—

কাছে ছিলে যবে ভাবি নাই তবে
কতখানি তুমি মোর কত কি

দূরে গেলে যবে মনে হ'ল তবে
গেছে সব, সকল স্বপন সুরভি॥

বধূ তখনও লিখিতে ও পড়িতে শিখে নাই, স্কুলের পড়ো ছোট ভাই হামিদকে দিয়া অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্টভাবে স্বামীর চিঠি পড়াইয়া উত্তর লিখাইয়া লইত। উত্তরে প্রায়ই থাকিত—আমি ভাল আছি, আপনারা কেমন আছেন জানাইবেন। আকবর অবাক হইয়া যাইত—এই কি তাহার চোখের জলের লেখা চিঠি? হায় কপাল! এতখানি কবিতা একদম মাঠে মারা। আর লিখিল না।

পাঁচ ছয় মাস পরে বধূ যখন ফিরিয়া আসিল—তখন সে আরও মধুর, আরও সুন্দর হইয়াছে। সারা দেহে লাবণ্যের পরিপূর্ণ দীপ্তি, পরাণ-পাগল-করা রূপের সম্মোহিনী প্রভাব উছলিয়া পড়িতেছে। এ তাহার ভাদ্রের ভরা নদীর দুকুল ভাসান আকুল ঢলঢল পরিপূর্ণ যৌবন। যে যৌবন পুরুষের পিয়াসীচিত্তকে পাগল বিভ্রান্ত ক'রে, আকুল আবেশে টেনে নিয়ে যায়, পুরুষকে জ্ঞানহারা বেহুস করে।

আকবর লেখা ভুলিয়া দোকানের কাজ অবহেলা করিয়া বধূর রূপের আকর্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া ধরা দিল, বধূর রূপ-সায়রের আরও গভীর তলে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া নেশায় বিভোর, পানে উন্মত্ত হইল। বৎসর শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল—দোকানের কাজে প্রায় পাঁচ শত টাকা লোকসান। বাপ তাহাকে নানা অকথ্য ভাষায় গালি দিলেন ও বাড়া হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আকবর লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমান ও আত্মগ্লানির তুষানলে দগ্ধ ও অভিভূত হইয়া কয়েকদিন ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল না। শেষে বাপ একদিন বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাহাকে প্রহারে উদ্যত হইলেন। অপমানিত হইয়া

সে চলিয়া যাইতেছিল, মা আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ও বুঝাইলেন বাপ মাথা গরম মানুষ এক কাজ ক'রে ফেলেছে তা আর করবি কি। দু' একদিন থেকে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে যেখানে যেতে হয় যা'স।

মায়ের অনুরোধ আকবর উপেক্ষা করিতে পারিল না, থাকিতে বাধ্য হইল। কিন্তু কয়েকদিন অনশনে কাটাইয়া শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে ভাত খাইল। স্বামীর অপমানে বধূ নিশ্চয় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল কিন্তু কি করিবে? দু' ফোটা সমবেদনার অশ্রু ছাড়া তাহার আর কি সম্বল আছে যাহ দিয়া সে স্বামীর অপমানের প্রতিশোধ লইবে! হায় বাঙ্গালার অভাগা মোস্‌লেম নারী! বিধাতা করিয়াছে তোমাদিগকে দুর্ব্বল, সমাজ সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তোমাকে করিয়া রাখিয়াছে এক অসহায় প্রাণ-সর্ব্বস্ব যন্ত্রমাত্র। তোমাতে মমতা বোধের প্রাণ আছে, পুরুষের মনযোগানোর মত রূপ আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই যে পুরুষের বিপদে একটুমাত্র সহায় হও।

কালে সব ফুরায়, কালে মানুষ সব ভুলে। আকবরের অপমানের ক্ষতও শুকাইয়া গেল, সে তাহার অপমানের জ্বালাও ভুলিয়া গেল। আবার নূতন উদ্যমে কাজে লাগিল। কিন্তু বিধাতা করিয়াছে তাহাকে একরূপ সে অন্য কিছু হইতে চাহিলে পারিবে কেন? কিছুদিনেই কর্ম্মোদ্যম শিথিল হইয়া আসিল। নিজের যাহা চিরকেলে স্বভাব তাহাই পুনরায় দেখা দিল। অতিরিক্ত কাজের ভার আসিয়া যখন তাহাকে চাপিয়া ধরিত কবিতার ভাবরূপে আলস্য আসিয়া তাহাকে বাধা দিত। এই matter of factএর worldএ, এই হিসাব নিকাশের দুনিয়ায় কবিতার ভাব যে মস্ত বড় একটা অনধিকার প্রবেশ তাহা সে জানিত

কিন্তু জানিলে কি হয়—স্বভাব যায় ম'লে। তাহার প্রায়ই মনে হইত—আচ্ছা কবিতাটা এখন শেষ করে ফেলি, কাজটা পরে হবে। এমনি করিয়া কত কাজ জমা হইয়া পড়িল। বাপ প্রথমে আকবরকে কাজে বেশ যত্নশীল হইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন—এবার সে ঠিক সারিয়া গিয়াছে কিন্তু বহুদিন পরে একদিন তদন্ত করিয়া দেখিলেন—যে যাহা তাহাই আছে। মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে বিরক্ত হইলেন। আকরর তাহা বুঝিল। সে ভাবিল—না, এ সব দোকানদারী কাজ তাহাকে মানিবে না। সাহিত্য চর্চ্চাতেই তাহার জীবনের সার্থকতা খুঁজিতে হইবে। কিছুদিন খাটিয়া সে সেই বইখানা শেষ করিল ও কলিকাতায় জনৈক প্রকাশকের নিকট পাঠাইয়া দিল। প্রকাশক মুসলমান, ফেরত দিলেন—চলিবে না। পুনরায় এক হিন্দু প্রকাশকের নিকট পাঠাইল, তিনি ছাপাইতে রাজী হইলেন কিন্তু কমিশনে।

আকবর তাহাতেই সম্মত হইয়া ছাপাইবার অনুমতি দিল। পরে অন্য একখানা বই লিখিতে আরম্ভ করিল—'হজরতের জীবনী' সমাজের নিকট মনোরম হইবে ভাবিয়া; কিন্তু শুধু মনোরম হইলেই চলে না, উপাদেয়ও হওয়া চাই। তাই হজরতের প্রচলিত জীবনী হইতে অবান্তর গল্প কথাগুলো বাদ দিয়া মাত্র তাঁহার জীবনের যথার্থ সারবান ও উপাদেয় ঘটনাবলী লইয়া লিখিতে লাগিল। ভূমিকায় লিখিল—মহম্মদের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হ'ল বা মহম্মদের ছায়া ছিল না, এ সব অলৌকিক কাণ্ডবাণ্ড নিয়ে মানুষের সমাজে মহম্মদের কোন দাম নেই। যে কথার দ্বারা মহাপুরুষকে সাধারণ মানুষের সকল চেষ্টা ও নাগালের বা'র করে দেওয়া হয় সে কথার দ্বারা তা'কে অমানুষ, অতিমানুষ বা পয়গম্বর প্রভৃতি প্রমাণিত করা যেতে পারে কিন্তু মানুষের সমাজে

মানুষের দরকারে মানুষের আপনার জন ব'লে কেউ প্রগাণিত হন না। মহাপুরুষের যে সব গুণাবলী তোমার আমার গ্রহণযোগ্য নয়, সে সব গুণাবলী তার হাজার থাক তোমার আমার বা অন্য কারও কিছু তাতে এসে যায় না। ইত্যাদি—

প্রায় দুই মাস পরে বইখানি শেষ করিয়া প্রকাশদের নিকট কলিকাতায় লইয়া গেল। ইসলামীয়া লাইব্রেরীর ম্যানেজার মৌলভী আকতার হোসেন বি, এ সাহেব বইয়ের হস্তলিপি ও ভূমিকা দেখিয়া বলিলেন, সাহেব! হজরতের জীবনী থেকে যদি অলৌকিক কাণ্ডগুলোই বাদ দিলেন তবে আর তাতে রইল কি? বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার কোন শিক্ষিত মুসলমানের মুখে এরূপ উক্তি খুব বিচিত্র নয় তাই আকবর তাতে বিস্মিত হইল না।

সে তাহার পূর্ব্বের বইখানি ছাপান হইয়াছে কিনা দেখিবার নিমিত্ত হিন্দু প্রকাশকের নিকট গিয়া জানিল—ছাপান হইয়াছে, এইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। আকবর বাড়ী আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ক'রে এলি?

—ছাপান হয়েছে, এইবার টাকা পাওয়া যাবে। মা হয়ত বিশ্বাস করিলেন না, আকবর তাহা বুঝিল।

এবার একখানি নভেল আরম্ভ করিল। একদিন ঘরের ভিতর বসিয়া লিখিতেছে, বধু পাশেই শায়িতা অবস্থায় কি ভাবিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে মা চিৎকার করিয়া কহিলেন—ওগো বউ, পুকুর থেকে কাপড় ক'খানা কেচে আন্‌তে বল্লাম, ক' ঝুড়ি মাটি এনে কুয়ার পাড়টায় দিতে বল্লাম, তা কি কাণের মাথা খেয়েছ, না—নিয়ে আরাম করত। দু'জনেই অকর্ম্মা হ'লে চলবে কেন?

শ্বাশুড়ীর মুখে এরূপ কথা আজ নূতন নয়, প্রায়ই হইয়া থাকে। শ্বাশুড়ী তাহাকে অন্যান্য বউদের অপেক্ষা একটু অতিরিক্ত খাটাইয়া লইতেও কসুর করেন না। বধূ বিনা আপত্তিতে তা খাটেও।

আজ কিন্তু বাস্তবিকই তাহার শরীরটা খারাপ ঠেকিতেছিল, তাই আলস্যবশে খানিক পরে করিবে ভাবিয়া ঘরে আসিয়া একটু বিশ্রামসুখ ও নির্জ্জন চিন্তা উপভোগ করিতেছিল। সহসা শ্বাশুড়ীর এই প্রকার বাক্যে অন্তরে একটু বিদ্ধ অথচ বাহিরে নির্ব্বিকার ভাব লইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। আকবরও মায়ের কথা শুনিয়াছিল; অন্তরে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ বাহিরে কিন্তু স্নেহের মোলায়েম স্বরে সে কহিল—আমার উপর সত্যিই খুব রাগ হয়, জাহানারা?

—'কি জানি' বলিয়া বিরক্তির সহিত রাগ ভরে অন্যদিকে ফিরিল।

—কিন্তু,কি করব, উপায় যে নেই, ভাগ্য ত মান?

—মানি, কিন্তু তোমার মত অমন ভাগ্য বোধ হয় দুনিয়ায় আর কারও নেই।

—অনেকের আছে, দুঃখ না থাক্‌লে জীবন থাকে? দুঃখই ত জীবনের আস্বাদ, জাহানারা!

—তা হ'লে আর মানুষ সুখ চাইত না, দুঃখ নিয়েই থাক্‌ত।

—দুঃখ নিয়ে থাক্‌তে জান্‌লে ত দুঃখ থাকেই না। সুখ দুঃখ মনের অবস্থা বিশেষ। কেউ যদি মনে করে সে দুঃখী কোটিপতি হয়েও সে দুঃখী। কেউ যদি মনে করে সে সুখী নিঃস্বম্বল হ'য়েও সে সুখী। কামনার অতৃপ্তিই হ'ল দুঃখ। মানুষ যা চায় পায় না বলেই দুঃখ বোধ করে। মানুষের চাওয়ার শেষ নেই, সুতরাং তার দুঃখেরও অবধি নেই। সুখ হ'ল কল্পনার ভবিষ্যতে, বাস্তব জীবনের বর্ত্তমানে সুখ নেই। সে

হিসেবে কেউ সুখী না। কোটিপতিরও অভাব আছে। আমার বিশ্বাস কোটিপতি অপেক্ষা দীন মজুরই হয়ত বেশী সুখী। কোটি পতি যে তার লোভটাও আবার তেমনি অসংযত, অস্বাভাবিক, দুর্ব্বার। দীন মজুরের জীবন অনেকটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া। অতৃপ্তির হাহাকার তাই সেখানে কম। সে ক্ষিদে পেলেই খায়, তৃষ্ণা পেলেই জল পান করে। কোন বিষয়ের অতিরিক্ততা তার জীবনের এই সব সাধারণ উপভোগে অরুচি এনে দেয় নি। ভাত জল প্রভৃতি জীবনের সাধারণ জিনিষের মূল্য ও মর্য্যাদা সেইখানেই বেশী উপলব্ধি হয় যেখানে ওগুলো অপরিমিত অতিরিক্ত না, পান ভোজনে সেই বেশী তৃপ্তি পায় যার পান ভোজন নিয়মিত জোটে না। জলের মূল্য সেইখানেই যেখানে জলকষ্ট আছে। তুমি অধীর হয়ো না, দুঃখকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখ। দুঃখ আমাদের পর না—একান্ত আপনার। দুঃখ আসে মানুষকে শুদ্ধ, বুদ্ধ ও পবিত্র করতে, শান্ত, সংযত সমুন্নত করতে; দুঃখ আসে মানুষের ইমানের পরীক্ষা হয়ে, ন্যায়, সত্য ও পবিত্রতার উপর যে ইমান তারই। দুঃখ আমাদের শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা; দুঃখ আমাদের পুণ্যময়, গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যত জীবনের পথ নিয়ন্তা। আমরা দুঃখকে জয় করব ধৈর্য্য, সাধনা ও ত্যাগ স্বীকায় দিয়ে।

স্বামীর কথা মোটামুটি ভাবে বুঝিয়া লইয়া বধূ কহিল—দুঃখের কথা কি বল্‌ছি? স্বাধীন অবস্থায় দুঃখ তবু সহ্য হয়, কিন্তু পরের কাঁধে চ'ড়ে দুঃখ ভোগের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝি না। খোঁচা দেওয়া কথা গুলো কেমন ঠেকে?

—খুবই রূঢ় ঠেকে কিন্তু এমন একদিন আস্‌বে যেদিন তারা তাদের ভুল বুঝ্‌তে পারবে ও আমাদের সত্যি ক'রে সম্মান করতে শিখ্‌বে।

আমি নিতান্ত বসে নেই, আমিও কাজ করি কিন্তু সে কাজের ফল হয়ত একটু দূরের—ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে পেতে হয় কিন্তু ফল একটা আছেই।

—কি জানি তোমার সে কী কাজ? আমি ত দেখি তুমি কেবলি অকাজ করছ—যার ফল কোনদিনই আস্‌বে না।

—নাও আস্‌তে পারে কিন্তু সেজন্য আমি দায়ী না, আমি ত প্রাণ পণে খেটে চলেছি। বধূ হয়ত না বুঝিয়াই চুপ করিয়া রহিল। আকবর আর বুঝাইতেও চেষ্টা পাইল না।

(২২)

ইহার কিছুকাল পরে আকবর একদিন স্ত্রীর নিকট বিদায় লইতে চাহিলে জাহানারা কহিল—কোথায় যাবে?

—যেখানে ইচ্ছে।

—তবু?

—কিছু ঠিক নেই।

—কিন্তু আমাকে কি ক'রে যাবে?

—তুমি এখানেই থাক কিংবা বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে কর যাও।

—বেশ, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি তারা এসে নিয়ে যাবে।

—কিন্তু যেখানেই থাক চিঠি দেবে ত?

—কোন স্থানে স্থায়ী না হ'তে পারলে চিঠি দিচ্ছি কি ক'রে?

—ছেলে মেয়ে যদি একটা কিছু হয় তারও কোন খোঁজ নেবে না ? (জাহানারা অন্তঃসত্বা)

—রোজগার করতে না পারলে চিঠি দিয়ে কি করছি ? তবে চেষ্টা করব।

—যাও, কিন্তু রোজগার করতে না পারলে এ বাড়ী আর এস না, আমাকেও এ অপমানের ভিতর আর টেনে এন না।

—তাই।

আকবর বাহুবেষ্টনে স্ত্রীকে বুকে আকর্ষণ করিয়া তাহার পোয়াতি পাণ্ডুর ফুল্লমুখে একটা চুমা দিল। জাহানারা উৎসুক চিত্তেই স্বামীর আলিঙ্গণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিবিড় আরামে চুপ করিয়া রহিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আকবর ঠিক করিল—সে কোন দূর দেশে গিয়া কোন মজুরের কাজ লইবে। যাহাদের জীবন কাহিণী লইয়া সে উপন্যাস লিখিতেছে তাহাদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে সে নেহাতই অনভিজ্ঞ। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নিমিত্তই তাহাকে মজুরদের দলে মিশিতে হইবে। বাড়ী হইতে অনেক দূরে একটা ষ্টেশনে যখন রেল হইতে অবতরণ করিল তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। সে ভদ্রবেশ ছাড়িয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া কয়েক বাড়ীতে আতিথেয়তা প্রার্থনা করিল। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু। তাহাকে মুসলমান জানিতে পারিয়া কেউ আশ্রয় দিতে রাজী হইল না। শেষে অনেক অনুনয়ের সঙ্গে একজনের বাড়ীতে রাত্রিযাপনের জন্য একটু জায়গা চাহিয়া লইয়া সেইখানেই রহিল। বলাবাহুল্য সে দিন কিছুই খাওয়া হইল না।

প্রত্যুষে উঠিয়া সে অন্যত্র কোন মুসলমান প্রধান গ্রামে যাইবার উদ্দেশে কিছুদূর চলিয়া আসিয়াছে এমন সময় রাস্তার পার্শ্বেই কোন

সব্জী ও তরকারির ক্ষেত হইতে ভদ্রলোক কছমের কে একজন চিৎকার করিয়া কহিলেন—বাড়ী কোথায়, মহাশয় ?

সে আবার মহাশয় হইল কি করিয়া? সে যে মজুরী প্রার্থী, মজুরের পোষাকই ত পরিয়া আছে ; পরণে একখানা ধুতি ও উড়ানি মাত্র। একটু বিমনা ভাবে উত্তর দিল—বাড়ী অনেকদূর নদীয়া জেলায়।

—কোথায় যাবেন ?

—ঘুরে বেড়াচ্ছি—কাজের চেষ্টায়।

ভদ্রলোকটীর কৌতূহল বাড়িয়া গেল। একটু আগাইয়া আসিয়া কহিলেন—কি কাজের চেষ্টায় ঘুরছেন ?

—যে কোন মজুরের কাজ ;

—মজুরের কাজ ?

—জি, হ্যা।

—কি কাজ করতে জান ?

—লাঙ্গল চষা ছাড়া যে কোন কাজ।

ভদ্রলোকটীর বিস্ময় বাড়িয়া গেল। সম্পূর্ণ নিকটে আসিয়া তাহাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—চাষার ছেলে ত!

—জি হ্যা।

—তবে লাঙ্গল চষ্‌তে জান না যে !

—জানি না, অভ্যাস নেই, এখন শিখ্‌তে হবে।

—কি করতে আগে ?

—সামান্য লেখা পড়া শিখেছিলাম, তারপর বসেই ছিলাম। এখন আর চলছে না।

—বাড়ীতে কে কে আছে ?

—কেউ নেই।

—তবে আর চল্‌ছে না যে!

—চল্‌ছে না এই জন্যে যে ভবিষ্যত ত আছে!

কথাবার্ত্তার ধরণে কিন্তু ভদ্রলোকটীর বিশ্বাস হইল না যে সে যাহা বলিতেছে তাহা ঠিক। নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য আছে ভাবিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার মতলবে কহিলেন—তবে আমার বাড়ীতেই চল, আমারও মজুরের দরকার।

আকবর দ্বিধা না করিয়া অনুসরণ করিল।

বাড়ী পৌঁছিলে ভদ্রলোকটী কহিলেন—আপনার সত্য পরিচয় কি বলুন। আপনাকে দেখে ও আপনার কথাবার্ত্তার ধরণে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে আপনি একজন সাধারণ চাষার ছেলে। লেখা পড়া শেখা ভদ্রসন্তান বলেই মনে হয়। সত্যি ক'রে বলুন—আপনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছেন।

আকবর দেখিল আর গোপন করা যায় না। সে সত্য ব্যাপারটা মোটামুটি খুলিয়া বলিল। ভদ্রলোকটী শুনিয়া কহিলেন—আপনি সত্যিই তবে বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছেন ?

—জি হ্যাঁ।

—তবে একটা মাষ্টারি নেন না। আমাদের একটা মাইনর স্কুল আছে, সেখানে স্থায়ী হেড মাষ্টার মিল্‌ছে না। মাইনে অল্প।

—কিন্তু মাষ্টারি করব না ভেবেই মজুরের কাজ খুঁজছি।

—কেন, মাষ্টারি করবেন না কেন ?

—করব না এই জন্য যে ওতে পেট ভরে না অথচ জীবনের অপব্যয় হয়। চাকুরি অথচ চাকুরির যা বাজার দাম তা ওতে নেই।

—কিন্তু মজুরের কাজে আপনি কি আশা করেন?

—মজুরের কাজে দাম নেই কিন্তু অভিজ্ঞতার মূল্য আছে। যদি খাটা অভ্যেস থাকে ও কাজ জানা থাকে কাজের অভাব হয় না। কিন্তু মাষ্টারিতে যদি এক জায়গায় পদচ্যুত হই অন্যত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না হ'লেও অনেক বেগ পেতে হয়। তা'ছাড়া আর একটা কথা -আপনারা aid (সাহায্য) প্রার্থী, আপনাদের হয়ে গভর্ণমেণ্টের মন জুগিয়ে চল্‌তে হবে আমাকে। পড়াতে হবে ইংরেজের ম্যালেরিয়া, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, আইন আদালত রাজা মহাজনের শোষণরূপ সুশাসন আর মুসলমান যুগের সেই ফন্দি ফাঁকি ও ষড়যন্ত্রহীন কুশাসন। আমরা যখন আইন আদালত রাজা মহাজন ও পুলিশের পীড়নে সর্ব্বশান্ত, রোগ শোক মহামারি ও দুর্ভিক্ষের পীড়নে কাতর মূর্চ্ছাতুর আর রাজা সেই সময় সাত সমুদ্র তের নদী পারে বসে পার্লামেণ্টের মানুষ দোহন ষড়যন্ত্রের নথীপত্রে চোখ কাণ বুজে একটা সই দিয়ে তাঁর Imperial allowance ভোগে রত, সে অবস্থায় শেখাতে হবে, প্রজার চিন্তায় রাজার ঘুম হয় না; প্রজা কিন্তু বেশ সুখেই আছে। চোরের ভয় নেই ইত্যাদি। এই মিথ্যের ব্যবসায় আমার রুচি হয় না, সাহেব।

ভদ্রলোক ধীরভাবে কহিলেন—রাজার কথা বলছেন? মুসলমান আমলে কি রাজা ছিল না এবং তাদের বিলাসিতা কি কিছু কম ছিল? আর সে সময় দেশে দুঃখ দৈন্য কি আদৌ ছিল না? ইংরেজের পার্লামেণ্টই যদি আপনার আক্রমণের বিষয় হয়, এ দেশের করপোরেশন

মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির দিকে তাকান ত! সেখানে আপনারাই ত সর্ব্বেসর্ব্বা! সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তাদের জন্য রেলের প্রথম শ্রেণী, মোটর প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণ না হলে কি চলে? তাহারা কি দেশের সাধারণ পাঁচজনের মত সামান্য ব্যয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারছেন? দেশের দরিদ্র সাধারণের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নিতে পেরেছেন? না যদি পেরে থাকেন, কি ক'রে বুঝব স্বরাজ পেলে দেশের দুঃখ কষ্ট একেবারে দূর হয়ে যাবে, গরীব আর গরীব থাক্‌বে না?

আর একটা কথা; ভগবান ত সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছে করলেই মানুষের দুঃখ দৈন্য একদিনে এমন কি এক মুহূর্ত্তে দূর করে দিতে পারেন. কৈ দেন না ত! স্বয়ং স্রষ্টা যদি তার সৃষ্টির দুঃখে এমন উদাসীন থাক্‌তে পারেন, কণা মাত্র শক্তির ক্ষুদে মানুষ সে অবস্থায় তার তুচ্ছ আত্মোৎসর্গের দ্বারা কতদূর কি করতে পারে? যদি ধরেই নেওয়া যায় দুনিয়ার সম্পদ সকল মানুষের ভিতর সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব তা হ'লেও কি যারা হীন, দীন ও দুর্দ্দশা-গ্রস্থ তাদের অবস্থার বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হবে? দীনতা ও হীনতা যাদের মজ্জাগত, ভিতরের শক্তি যেখানে শূন্য, বাহিরের যে কোন অবলম্বন সেখানে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য নয় কি?

আকবর—আপনি তবে পরাধীনতাই পছন্দ করেন?

—করিনে, স্বাধীনতার চেষ্টা যে ভাল তাও স্বীকার করি কিন্তু সে স্বাধীনতা অর্জ্জন করবেন কি ইংরেজের নিন্দে করে ও গাল দিয়ে আর সেই সঙ্গে নিজেদের সহস্র গলদ চেপে রেখে?

—আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা পেলেই গলদের সংস্কার সম্ভব হবে, তার পূর্ব্বে নয়।

—ভাবুন ত, পরাধীনতা আগে কি আপনাদের গলদ আগে? আপনারা যখন স্বাধীন ছিলেন তখন কি আপনাদের গলদ ছিল না? এমন কখন কি শুনেছেন কোন ইংরেজকে তার জাতির বিরুদ্ধে কেউ নিযুক্ত করতে পেরেছে, কিন্তু মীরজাফরকে ক্লাইভ পেরেছিল। মীরজাফরের সে গলদ মনে করবেন না শুধু মীর জাফরেই সীমাবদ্ধ ছিল, মীরজাফর রূপ স্বজাতি ও দেশদ্রোহী আরও অনেক ছিল, এখনও আছে। ইংরেজ বঙ্গ জয় করেছিল না হয় চাতুরি করে কিন্তু শুধু বঙ্গদেশ লইয়াই ত ভারতবর্ষ নয়! ইংরেজ যে অখণ্ড ভারত তথা অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর সেটা কি শুধু chance, না, তার যোগ্যতা? এই যোগ্যতা বলিতে আসুরিক শক্তি বুঝায় না; যোগ্যতার পিছনে প্রথমে থাকে চরিত্রবল। চরিত্রবলই একতা আনে আর একতার ভিত্তিতেই আসুরিক শক্তি প্রয়োজনবশতঃ পরে গড়ে উঠে কিন্তু ঐটাই গোড়ার কথা নয়। অনার্য্যের চেয়ে আর্য্যেরা এইরূপ যোগ্য ছিল বলেই আর্য্য তাকে জয় করতে পেরেছিল। আবার আর্য্য হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অপেক্ষাকৃত যোগ্য ছিল বলেই মুসলমান তাকে জয় করতে পেরেছিল, আবার মুসলমানের চেয়ে ইংরেজ যোগ্য বলেই ইংরেজ তাকে জয় করতে পেরেছে। যোগ্যের নিকট অযোগ্যের এই পরাজয় বা Survival of the fittest জীবনের সর্ব্বস্তরে। ইংরেজের প্রভুত্বকে আপনারা ঘৃণা করতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন এই প্রভুত্বের কারণ তার মনুষ্যত্ব হীনতা নয়, আপনাদেরই দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা ও অযোগ্যতা। ইংরেজের নিকট স্বাধীনতা ও সমানাধিকার দাবী করার পূর্ব্বে ভেবে দেখবেন আপনাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে কি আপনারা স্বাধীনতা ও সমাধিকার দিয়েছেন?

স্বাধীনতা ও সমাধিকার কেউ কাউকে দিতে পারে না বা চেয়েও পাওয়া যায় না; অর্জ্জন করে নিতে হয়। আজ যদি ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যায় কালই তবে জার্ম্মান, জাপান অথবা আফগান এসে দখল করে নিয়ে কঠোরতর শাসন শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেল্‌বে না তা কে বল্‌তে পারে? মনুষ্যত্বের চর্চ্চা ও যোগ্যতা অর্জ্জন করুন—সকলের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ এক করে দেখ্‌তে শিখুন; ৩৫ কোটী মানুষ যেদিন মনুষ্যত্বের এই শক্তিতে এক হয়ে দাঁড়াবে সেদিন ইংরেজ বোধ হয়, আপনাদের স্বাধীনতার দাবী অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

এই মনুষ্যত্বের স্ফুরণের জন্য চাই শিক্ষা—সার্ব্বজনীন শিক্ষা। ৩৫ কোটি মানুষকে যদি শিক্ষার দ্বারা উন্নত করতে পারেন তখন দেখবেন ধর্ম্মবিরোধ আপনি শান্ত হবে। শিক্ষিতের ভিতরও ধর্ম্মবিরোধ আছে—তার কারণ এই, অশিক্ষিত কোটি কোটি লোকের অন্ধ ধার্ম্মিকতার প্রভাব রয়েছে পিছনে। এই অশিক্ষিত কোটি কোটি লোক যেদিন শিক্ষার আলোকে উঠে আসবে সেদিন এ প্রভাব আর থাকবে না। সেদিন মানুষ এক হবে এবং স্বরাজও পাবে। এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলোই আপনারা ভেঙ্গে দিচ্ছেন? বল্‌তে পারেন এ গুলো defective (দোষদুষ্ট) কিন্তু নেই মামার চেয়ে যে কাণা মামা ভাল তা কি স্বীকার করেন না। যে গড়তে না জানে তার ভাঙ্গারও কোন অধিকার নেই তাও কি মানেন না? মুষ্টিমেয় ক'জনে শিক্ষা সীমাবদ্ধ বলেই তাতে গলদ দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার সার্ব্বজনীন বিস্তারে এ গলদ দূর হবে।

আকবরের মনে হইল—কথাগুলো হয়ত মিথ্যে নয়। নেই মামার চেয়ে যে কাণা মামা ভাল এটাও সত্য। সার্ব্বজনীন শিক্ষার দ্বারা যে

শিক্ষার গলদ দূর হতে পারে এও মস্ত বড় কথা। সে সম্মতি দিয়া কহিল—আচ্ছা আমি রাজী আছি।

শিক্ষকতা কার্য্যে আকবর বেশ আমোদ পাইতে লাগিল। পল্লীর ছাত্রেরা স্বভাবতঃই ধীর নম্র ও শান্ত প্রকৃতির। তাহাদের সরল ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে আকবর ভারি মুগ্ধ হইল। মাহিনা যতই সামান্য হউক না কেন কাজের নেশা তাহাকে মাতাইয়া তুলিল। অধীনস্থ শিক্ষকেরা সকলেই স্থানীয়, নামমাত্র বেতনে কাজ করেন। সে নামমাত্র বেতনও এক একজনের ৫।৬ মাস করিয়া বাকী পড়িয়া আছে। তথাপি তাঁহারা টিকিয়া আছেন হয়ত এইজন্য যে তাহারা অন্য কোন কাজে অনভ্যস্ত ও অনুপযুক্ত আর আশা আছে ভবিষ্যতে সাহায্য মঞ্জুর হইলে নিয়মিত ও বর্দ্ধিত হারে বেতন পাইবেন। ইনস্পেক্টর সাহেব ৫।৬ মাস অন্তর একবার করিয়া পরিদর্শন ছলে আসিয়া নানা আশার কথা শুনাইয়া যান। কিন্তু কতদিন গিয়াছে সাহায্য আজিও মঞ্জুর হয় নাই। তবে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে হইবার কথা আছে! শিক্ষকেরা অনেকে হতাশ হইলেও একবার করিয়া স্কুলে আসিয়া নাম সহি করিয়া যাইতে ভুলেন না। বিলম্ব ও অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই সংসার কার্য্যের দোহাই দেন। সেক্রেটারি সাহেবের বিপরীত হুকুম থাকা সত্বেও আকবর সে দোহাই মানিয়া না লইয়া পারে না। সংসারের দিকে না তাকাইয়া কেমন করিয়া একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় চিরদিন ধরিয়া স্কুলের কাজে ব্যাগার খাটা একজনের পক্ষে সম্ভব? ফলে স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ৫।৬ জন থাকিলেও একা তাহাকেই সমস্ত কাজ করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও সে অনিচ্ছুক নয়, একমাত্র ছেলেদের মুখ চাহিয়া। ছেলেরা তাঁহাকে খুবই মান্য ও ভক্তি করে, সে প্রতিদানে তাহাদিগকে

প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ; পড়া শুনার দিক দিয়া বড় একটা কিছু হয় না। স্কুলের ছুটীর পর প্রত্যহ কিছু জলযোগ করিয়া আকবর বেড়াইতে বাহির হয়—মাঠের দিকে। শ্যামল শস্য ও তৃণগুচ্ছ শোভিত চষা ও অ ষা ভূমির বহুদূর প্রসারিত দৃশ্য তাহাকে ভারি আকৃষ্ট, মুগ্ধ করে ও তৃপ্তি দেয়। কৃষাণেরা জমিতে কাজ করে—লাঙ্গল, নিড়ানি অথবা অন্য কিছু লইয়া ; পরিধানে একখণ্ড মাত্র সামান্য বস্ত্র। তাহাদের দেখিয়া আকবরের মনে হয়—জমিকে যাহারা এমন করিয়া ভালবাসে, আপন প্রাণের সবটুকু যত্ন ও পরিশ্রম দিয়া যাহারা জমির সেবা করে তাহারা জমির মালিক না। জমির মালিক সেই যাহার সঙ্গে জমির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, জমিকে যে কখন দেখে নি, চেনে না। কি অদ্ভুত অমানুষিক ব্যবস্থা এ! আকবরের ইচ্ছা হইত তাহার যদি কোন মন্ত্রশক্তি থাকিত তবে এই মুহূর্ত্তে যে আসুরিক শক্তি এ নির্ম্মম ব্যবস্থাকে পালন করিতেছে তাহাকে পরাভূত করিয়া জমির যথার্থ মালিককে জমি ফিরাইয়া দিত। কিন্তু হায়! দুরাশা মাত্র। যে ভদ্রলোকটি আকবরকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তিনি সহরে চাকুরি করেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা এখনও বর্ত্তমান। তিনিই সমস্ত দেখা শুনা করেন। তাঁহার বাড়ীতেই আকবরের জায়গীর ঠিক হইযাছে। বৈঠক ঘরে যখন ছাত্রদের লইয়া পড়াইতে বসে তখন প্রায়ই বাড়ীর ও পাড়ার কৃষাণেরা সমবেত হইয়া গল্প গুজব করে। গল্পের বিষয় থাকে প্রায়ই 'ভূত'। কোথায় কে কবে ভূত দেখিয়াছিল, কেমন করিয়া কি করিয়াছিল, বিজ্ঞের মত বর্ণনা করে অপর সকলে বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকেরা ভয়মিশ্রিত কৌতূহলের সহিত বসিয়া শুনে। সময়ে সময়ে সাহিত্য সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। একবার

এক নিমন্ত্রণ পত্রের মর্ম্ম লইয়া ভারি বিতণ্ডা বাধিল "ভাইভ্রাতা" শব্দের অর্থ কাহারও মতে এক বাড়ীর সকলে কাহারও মতে পাড়ার সকলে। কিছুতেই মীমাংসা হয় না। শেষে এক প্রবীণ কচ্ছমের লোক আসিয়া বুঝাইয়া দিল যে ভাইভ্রাতা শব্দের অর্থ একবাড়ীর সকলে ও 'ভাইবেরা' শব্দের অর্থ পাড়ার সকলে। সকলে তাহাই মানিয়া লইল। আকবর এই সকল তর্ক ও আলোচনায় নিজে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দূর হইতে বেশ উপভোগ করিত। সময়ে সময়ে তাহাদের দুই একটা কথায় তাহার হাস্য সম্বরণ করা দায় হইত।

এইরূপেই দিন কাটিতে লাগিল। ছয় মাস পরে ইনস্পেক্টর সাহেব আসিলেন। তদন্ত করিয়া দেখিলেন—পড়াশুনা তেমন সুবিধা হয় নাই। কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে আকবর কহিল—যদি অপরাধ না নেন তবে বল্‌তে পারি। ইনস্পেক্টর কুতূহলী হইয়া কহিলেন—কি বলুন।

—স্কুলের যে অবস্থা তাতে করে it requires more feeding than grooming। শুধু পরিদর্শন আর উপদেশেই কিছু হবে না; যদি সাহায্য স্বরূপ একে কিছু দেন তবে মাষ্টারেরা সময় মত উচিত বেতন পেলে মন দিয়ে কাজ করলে পড়া শুনার উন্নতি হ'তে পারে। পড়া শুনা কেমন হয় না হয় সেজন্য ত পরীক্ষা রয়েছে। খাতা পত্র যা দরকার তা আপনার আপিসে গিয়েই আমরা দেখিয়ে আস্‌তে পারি।

ইনস্পেক্টর সাহেব গরম মেজাজে তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন—আপনি কতদিন হ'ল মাষ্টারি করছেন?

—প্রায় ছ'মাস।

—এর আগে কোথায় ছিলেন?

—কোথাও না

—সেক্রেটারী সাহেব, হেড মাষ্টার না বদ্‌লালে আপনারা এড্ পাবেন না।

আকবর শুনিয়া একটু হাসিল।

ত্রিশ টাকা হিসাবে ছয় মাসের বেতন পাইয়া আকবর বাড়ী রওনা হইল। বাড়ী পৌছিলে পিতার সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় ছিলে ?

—যশোহর জেলায় কোন স্কুলে মাষ্টারি করছিলাম।

—বেশ, বাড়ী গিয়ে সুস্থ হওগে, সকলে ভেবে অস্থির।

—মা তাহাকে দেখিয়া খুব খুসী হইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ও খাইতে দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আকবর শ্বশুরবাড়ী রওনা হইল। বিবাহের কিছুকাল পরেই শ্বশুর মারা যান। সেখানে পৌছিলে শাশুড়ী তাহার তিন মেসে ছেলেটীকে আনিয়া ক্রোড়ে দিল। জ্যোৎস্নার মত ফুটফুটে ছেলেটীকে ক্রোড়ে লইয়া বার বার চুমা দিতে দিতে কহিল

—অনাদরের বাছা আমার ওরে
দুঃখী এবং দীনের ঘরে এসেছিস তুই
কি মনে ক'রে ?

কয়েকদিন সেখানে কাটাইয়া সকলের অনিচ্ছা সত্বেও স্ত্রী ও সন্তানকে লইয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী রওনা হইল।

বাড়ীতে প্রায় একমাস গত হইলে মা একদিন কহিলেন, হাগো আকবর, তুই যে কোথায় কি কাজ করছিলি সেখানে আর গেলিনে ?

—সে কাজ ত আমি ছেড়ে এসেছি।

—কেন ?

—কারণ ছিল।

—এখন তবে কি করবে?

—চেষ্টায় আছি অন্য কোন কাজের.

—চেষ্টায় আছ কি ঐ ঘরের ভিতর শুয়ে শুয়ে?

—আকবর কোন উত্তর দিল না।

মা পুনরায় কহিলেন—সারা জীবনটা ঐ ভাবে কাটালে কি করে চল্‌বে? আজ না হয় বাপ মা আছে। এতলোকের ছেলে লেখা পড়া শিখে কত কি হ'ল, তুমি একটা কিছুও হতে পারলে না। সকলি আমার কপাল! বলিয়াই মা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন।

আকবর তখন সাপ্তাহিক খবরে কাগজে Wanted Column দেখিতেছিল। মায়ের কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

কয়েকদিন পর জাহানারা একদিন অনুযোগের স্বরে কহিল—আমি যে দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছি একবার দেখ্‌লে না? আকবর বিস্মিত আতঙ্কে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—কোথায় কি হচ্ছ?

জাহানারা ক্রুদ্ধ অভিমানে কহিল, তোমার চোখ আছে তাই দেখ্‌বে!

আকবরের ইচ্ছা হইল তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া কোন বড় চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন কিছুকাল রাখে। কিন্তু সেরূপ সংস্থান তাহার কৈ? টাকাগুলো যদি সে বাপকে না দিয়া ফেলিত!

কয়েক জায়গায় মাষ্টারিতে দরখাস্ত করিয়াছিল, শেষে এক 'সঙ্গীত ও সাহিত্যানুরাগী গৃহশিক্ষক চাই' এর নিকট হইতে উত্তর আসিল। মাসিক ৫০৲ টাকা মাহিনা। শীঘ্র কাজে যোগ দিতে হইবে।

(২৩)

যে বাড়ীতে আকবর গৃহ-শিক্ষকের কাজ পাইয়াছিল সেটা ফরিদপুর জেলায় কোন বিখ্যাত মুসলমান জমিদারের বাড়ী। জমিদার সাহেব একজন এম, এল, সি ও প্রবীণ পৌঢ় বয়সের ভদ্রলোক। দেখিলেই মনে হয় তিনি একজন বিজ্ঞ-সুবিবেচক ও উদার প্রকৃতির মানুষ। জমিদার হইলেও জমিদারোচিত আড়ম্বরপ্রিয়তা তাঁহার নাই। বেশ মিতব্যয়ী ও ধৈর্য্যশীল, শিক্ষা, সাহিত্য ও দেশের সকল সদনুষ্ঠানের প্রতিই তাহার একটা আন্তরিক টান আছে। তাঁহার বাড়ীটা পল্লী অঞ্চলে হইলেও লোকশিক্ষার জন্য তিনি বাড়ীতে এক লাইব্রেরী রাখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার নিজের পড়িবার জন্য একখানা দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা ও প্রধান প্রধান সকল সাপ্তাহিক ও মাসিকই লওয়া হয়। আধুনিক ও পুরাতন সকল বড় বড় লেখকের লেখা পুস্তক ও তাহাতে রাখা হয়। সকল প্রকাশকদের বলিয়া দেওয়া আছে কোন ভাল লেখকের লেখা বাহির হইলেই তাহাকে যেন পাঠান হয়। এদিক দিয়া তাহার খরচও

নিতান্ত কম হয় না। তাঁহার জমিদারির আয় অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা, তাহার অৰ্দ্ধেকই তিনি লোকহিতকর কাজে ব্যয় করেন। নিজের সংসার খরচ বাদে যাহা থাকে তাহা তিনি ব্যাঙ্কে জমা রাখেন কোন দুঃসময়ে দেশের কাজে লাগাইবেন ভাবিয়া। জমিদার সাহেবের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের মধ্যে একজন কলিকাতায় কোন কলেজে বি, এ পড়ে ও অপরটী স্থানীয় হাই স্কুলে এবার ৫ম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াছে। কন্যা দুইটীর বয়স যথাক্রমে বার ও চৌদ্দ। বাড়ীতেই প্রাইভেট পড়ান হয়। এই তিনটী সন্তানকে পড়াইবার জন্যই আকবরের নিযুক্তি।

জমিদার সাহেব সন্তান কয়টীকে দেখাইয়া কহিলেন—মাষ্টার সাহেব, এই কয়টীকে আপনার পড়াতে হবে। এদের শিক্ষা চরিত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই লক্ষ্য রাখবেন। আপনার মাহিনা ৫০৲ টাকা উল্লেখ থাকলেও সন্তোষজনক ফল অনুসারে বেতন পাবেন। আপন ছোট ভাই বোনদের মতই এদের দেখ্‌বেন। যদি স্থায়ী ভাবে থাক্‌তে চান যতদিন ইচ্ছে থাক্‌তে পারবেন।

সকাল বৈকালে মাত্র ৩ ঘণ্টা করিয়া ৬ ঘণ্টা পড়াইয়া আকবরের ছুটী। অবশিষ্ট সময় তাহার লাইব্রেরীতে কাটে। সেখানে অজস্র পুস্তক সমভিব্যবহারে প্রচুর নির্ব্বিঘ্ন অবসর সুযোগে সে তাহার বহুদিনের তৃষিত প্রাণকে স্নিগ্ধ করে। জমিদার সাহেব মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যান—সে পুস্তক লইয়াই আছে। বোধ হয় মনে মনে ভাবেন, এতদিনে তাহার মূল্য দিয়া তৈয়ারী লাইব্রেরীর যথার্থ সৎব্যবহার হইতেছে। নূতন বই আসিলে জমিদার তাহা নিজে একবার না পড়িয়া লাইব্রেরীতে দেন না। সেদিন "ধর্ম্মের

গুণ্ডামি” নামে একখানা নূতন বই লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া আকবরের হাতে দিয়া কহিলেন—মাষ্টার সাহেব পড়ে দেখুন ত এই বইখানা। আপনার কোন্ মিতের লেখা এ! আকবর কৌতুহলের সহিত হাতে লইয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই বই এতদিন পরে বাহির হইয়াছে। সে মনে মনে খুব উৎফুল্ল হইলেও জমিদারকে কিন্তু বলিতে সাহস পাইল না যে তাহারই লেখা সে বই। জমিদার সাহেব সাহিত্যানুরাগী উদার প্রকৃতির মানুষ হইলেও তাহার লেখা প্রশংসার সহিত গ্রহণ করিবার মত উদার কিনা কে জানে ?

জমিদার সাহেব প্রস্থান করিলে আকবর ভাবিতে লাগিল—জমিদার সাহেব নিশ্চয়ই এক সময় এ বইখানি সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন, সে তখন কি বলিবে ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল. নিজের স্বরূপকে সে কখন ঢাকা দিবে না, তাহার মতামত নিঃসঙ্কোচে জগতের কাছে খুলিয়া বলিবে, তাহাতে তাহার দুনিয়ার স্থান না জুটে নাই জুটিবে।

আকবর যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই। জমিদার সাহেব একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—সে বইখানি পড়েছেন, মাষ্টার সাহেব ?

আকবর বিনয়ের সহিত বলিল—জি হাঁ

—বলুন ত আপনার মতামত কি ?

আকবর ততোধিক বিনয়ের সহিত জানাইল যে সে বইখানি তাহারই লেখা

জমিদার সাহেব খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, আপনার লেখা ! আপনি এমন সুন্দর লিখ্‌তে পারেন, মাষ্টার সাহেব ! তবে লেখেন না কেন ?

—লিখব, অবসর কৈ ? তা'ছাড়া সব সময় inspiration (প্রেরণা) আসে না।

—আপনার আর লেখা আছে যা ছাপান হয়নি ?

—আছে।

—সঙ্গেই আছে ?

—জি হাঁ।

—আমাকে দেখাবেন ত দয়া ক'রে।

আকবরের যাবতীয় লেখা মনোযোগের সহিত পড়িয়া লইয়া জমীদার সাহেব কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কতদিন হ'ল আপনি কলেজ ছেড়েছেন ?

—প্রায় পাঁচ বৎসর আগে।

—এতদিন কি করছিলেন ?

—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

—বলুন না শুনি ?

আকবর নিজ জীবনের আদ্যপ্রান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। জমীদার সাহেব শুনিয়া কহিলেন—আপনার কি মনে হয় আপনি ঠিক করেছেন, আকবর সাহেব ?

—ঠিক করেছি কি বেঠিক করেছি সে আমার ভাগ্য দেবতাই জানে, আমি যা করেছি তা না ক'রে আমার অন্য উপায় ছিল না।

—আপনি কি মনে করেন কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছেন ?

—কতকটা তাই।

—আমার কিন্তু মনে হয় আপনি ভুল করেছেন। যদি বি. এ, টা পাশ ক'রে এ সব খেয়ালে নাম্‌তেন তবেই ভাল করতেন। দুনিয়ায়

কোন কিছু করতে হ'লে আগে চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা। আপনার কথা কে শুন্‌বে বলুন ত?

—আমার বিশ্বাস, আমার কথা যদি সত্য হয় আজ না হয় একদিন জগতের লোক তা শুন্‌তে বাধ্য হবে। ফরাসি বিল্পবের জন্মদাতা রুষো (Russau) খুব প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিলেন না। ইসলামের পয়গম্বর হজরত মহম্মদও খুব গণ্যমান্য ধনী ছিলেন না। আমার উপর দিয়ে যে দুঃখের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে—আমার বিশ্বাস এ একদিন পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও বিমল সার্থকতায় জীবনকে আমার ভ'রে দেবে।

জমিদার সাহেব মৃদু হাসিলেন ও অন্তরে পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। ভাবিলেন—হয়ত ও একটা খেয়াল বা বাজে সান্ত্বনাও হইতে পারে এবং প্রত্যেক জীবনেরই তাহা আছে। কিন্তু এমন করিয়া একটা আদর্শের পিছনে জীবনের ব্যর্থতা বয়ে বেড়ানোয় যতখানি ধৈর্য্য ও ও সাহসের দরকার তাহা হয়ত অনেকের নাই। এই ধৈর্য্য ও সাহস ছিল বলিয়াই ত জগত বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের লাভে ধন্য হইয়াছে। খানিক চুপ থাকিয়া কি ভাবিয়া লইয়া কহিলেন—আমি বল্‌তে পারিনে যে আপনার জীবন ব্যর্থ হচ্ছে। হয়ত আপনার সংস্পর্শে এসে অনেক জীবন সাড়া পেয়েছে, হয়ত অনেক প্রাণ চির গভীর অন্ধকার থেকে উর্দ্ধে একটু আলোর রশ্মি দেখ্‌তে পেয়ে ধন্য হয়েছে। জগতে কোন কিছুই একেবারে বৃথা যায় না। আপনার অলক্ষ্যে লোকচক্ষুর অগোচরেও হয়ত আপনি অনেক কাজ করছেন যার ফল খুবই মূল্যবান।

নদী যে কেবল বাহিরেই প্রবাহিত হয় এমন নয়, মাটীর নাচে লোকচক্ষুর অগোচরেও অনেক স্রোতধারা আছে যা নাকি অনেক উৎস ধারা সৃষ্টি করে অনেক বড় বড় নদীর জন্ম নেয়। নদীর আসল উৎপত্তি

স্থান কারও চোখে পড়ে না, কিন্তু চোখে পড়ে না বলেই যে তা নগণ্য, এমন নয়। এইজন্যই হয়ত কবি বলেছেন—The world knows nothing of its greatest men (জগত তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

আকবর হেট মাথায় মৌনী হইয়া শুনিতেছিল। জীবনে কাহারও নিকট এমন একটু প্রশংসা উপভোগ করিবার মত সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। এতদিনে তবু অন্ততঃ একটা লোকও তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছে ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। আকবর বাধা দিল না। জমিদার সাহেব বলিতে লাগিলেন—আজ আপনি হয়ত ঘটনা স্রোতে আমার এখানে এসে পড়েছেন এবং আপনার মত অমন একটা মহা প্রাণকে কাছে পেয়ে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি। কাল হয়ত আপনি অন্যত্র যাবেন, কিন্তু যেখানেই থাকেন আমাকে যদি না ভুলেন এবং আপনার মতের কিছু পরিবর্ত্তন করে ধ্বংসের পথে নয়, গঠনের পথে দেশের কাজে লাগেন, আমি আপনার জীবন সঙ্কল্পে যথাসাধ্য সহায়তা করব।

আকবর মৃদু হাসিয়া কহিল—আজ হয়ত আমাকে আপনার ভাল লেগেছে, কাল হয়ত আর লাগবে না!

—আমাকে অতটা ছেলেমানুষ মনে করবেন না। আমি মানুষের ছোট ছোট দোষ ত্রুটি toleration (সহনশীলতা) এর চক্ষে দেখতে জানি। আমি কেবল appreciate (প্রশংসনীয় মনে করা) করছি আপনার ভিতর যে একটা মহৎ প্রাণ আছে সেইটাকেই; সেটা আপনি ইচ্ছে করলেও আপনার স্বভাব থেকে দূর করতে পারবেন না। সে আপনার মজ্জাগত।

আকবর প্রফুল্ল আনন্দে ধন্যবাদপূর্ণ চাহনীতে চাহিয়া কহিল—আমার কপাল!

প্রত্যহ বৈকালে জমিদার সাহেব আকবরকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন—দূরের গ্রাম ও মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়া।

একদিন চলিতে চলিতে জমিদার সাহেব কথা প্রসঙ্গে কহিলেন—ধরেন যদি আপনারা স্বাধীনতাই পান ও আপনাকেই স্বরাজ তন্ত্রের dictator (মন্ত্রদাতা) করা হয়, আপনি কি ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনার মন্ত্র দেবেন?

— প্রথমতঃ আমি সমাজ থেকে স্বার্থের প্রতিযোগিতা তুলে দেব।

—বুঝলাম না।

—স্বার্থের প্রতিযোগিতা মানে পেটের দায়ে সংগ্রাম, মানুষের সমাজে কেন তা থাকবে? মানুষ ত পেটসর্ব্বস্ব পশু নয়। পশুর পক্ষে যা শোভা পায়, মানুষের পক্ষে তা পায় নাকি? লালসার খাতিরে, স্বার্থের অনুরোধে যখন ভাই ভাইকে শাণিত কৃপাণ মুখে বলি দেয়; সামান্য দুটা টাকা, সামান্য একটু অধিকার নিয়ে যখন ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করতে দেখি তখন তার চেয়ে ঘৃণার, লজ্জার ও কুৎসিত দৃশ্য আর কি হতে পারে?

সংগ্রাম থাকবে, প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু এই পেট নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে. লালসার খাতিরে নয়, অন্য একটা বৃহত্তর জিনিষের অনুপ্রেরণায়। মানুষের ভিতর কি সে জিনিষ নাই?

শুধু খেয়েই কি মানুষের তৃপ্তি? লালসার ইন্ধন জুগিয়েই কি মানুষের সুখ?

আমার বিশ্বাস তা নয়। আপন ইচ্ছায় হাসি মুখে যে মানুষ মরতে জানে, অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম বিলাস ও ভোগলালসা ত্যাগ করে যে মানুষ বনে যায়, তার আবার সুখের অভাব, আনন্দের অভাব ?

মানুষ লড়বে, স্বার্থ নিয়ে নয়—Principle নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় নিয়ে। একমাত্র এই নিষ্কাম প্রতিযোগিতাই মানুষের ক্রমোন্নতির ধারাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে। মানুষ যখন খেলা করে তখন কি সে কম শক্তি প্রয়োগ করে? খেলার ছলে যে কাজ মানুষ করে সে কাজ যত সহজে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় অমন কি আর কিছুতেই হয়? খেলার প্রতিযোগিতায় মানুষ হারে কিন্তু মরে না পাথর চাপা পড়ে।

কাজের আনন্দেই মানুষ কাজ করবে, লাভের আশায় নয়। লাভ যা হবে তা সাধারণের যোগ্য, একা তার নয়। তার শক্তি, সামর্থ্য যা দিয়ে সে কাজ করে তা কি অনেকটা সাধারণের কাছ থেকে পাওয়া নয়? যা দিয়ে তার জীবনের পুষ্টি সে কি সাধারণের দান না? ষ্টেট হ'ল এই সাধারণের প্রতিনিধি। ব্যক্তির কাজের লাভ ষ্টেটের প্রাপ্য। ষ্টেটের কাছ থেকে ব্যক্তির যা প্রাপ্য তা সকলের সঙ্গে সমান অংশ, কারও চেয়ে বেশী কম না।

ইহা বল্‌শেভিজম্ হতে পারে, কমুনিজম্ হতে পারে, কিন্তু মানুষের সমাজে ইহাই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। তা ভিন্ন লালসার জগতে সুখ কৈ ? কোটি পতি যে, সেও কি সুখী ? সেও যে সহস্র দুশ্চিন্তায় বিকার গ্রস্থ। তার কত ভয়, পাছে হারায়, কত ক্ষোভ—সে আরও বড় নয়।

—মান্‌তে পারলাম না আকবর সাহেব, কাজের আনন্দে ক'জন

মানুষ কাজ করতে চায়? তা যদি করত তবে প্রত্যেকেই কেউ না কেউ একজন হয়ে পড়ত। তা করে না বলেই ত এই দুর্দ্দশা।

মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার মূলে আর কিছু নয়, মানুষের পাপ, মানুষের অবহেলা, আলস্যপ্রিয়তা ও কর্ম্মবিমুখতা।

—যে কাজ করতে জানে তারও জীবনে দুঃখ দুর্দ্দশা কি কম? লালসা যেখানে রাজা সুখ সেখানে কিছুতেই সম্ভব নয়।

—কিন্তু লালসাকে রাজা না করে আনন্দকে রাজা করার অধিকার ত সকলেরই আছে!

—কিন্তু আনন্দকে যে জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে মানুষের অভাব দৈন্য। আর সে অভাব দৈন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা হ'ল লালসা। লালসাই মানুষকে চাওয়ায়, আর চাওয়ার উত্তেজনাই মানুষকে দিগভ্রান্ত ক'রে তার চরম পরমকে গুলিয়ে ভুলিয়ে দেয়, আর সে জন্যই মানুষ অসুখী হয়। আঁলস্য প্রিয়তা যে মানুষের স্বভাব নয় তার দৃষ্টান্ত শিশু। সে সর্ব্বদাই অস্থির চঞ্চল ও আনন্দিত। সত্য বটে পাঠ্যাবস্থায় শিশুকে সময়ে সময়ে goading (চালনা) এর দরকার হয় কিন্তু সেটা যতটা সম্ভব পার্থিব সুখ সম্পদে বঞ্চিত না করে মানুষের কর্ম্মজীবনেও রেখে দেওয়া যেতে পারে

জমিদার সাহেব শুনিয়া একটু মৃদু হাসিলেন ও কহিলেন —আপনাদের এ থিওরি (theory) শুন্‌তে কিন্তু বেশ কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে কতটা খাটে বা না খাটে পরীক্ষার বিষয়।

—বেশ তবে পরিক্ষাই হ'ক

—আপনাদের theory (মতবাদ) আপনারাই ত পরীক্ষা করবেন।

—এ আদর্শ কাজে পরিণত করতে হ'লে আগে চাই স্বাধীনতা কিন্তু সে স্বাধীনতার পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরায়—ধর্ম্ম ; যে ধর্ম্মের দেওয়া মিথ্যা সান্ত্বনা নিয়ে মানুষ তার জীবনকে ভুলে গিয়েছে। পরাধীনতার বেদনা তাই আজ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেনি। বিদেশী শোষণ শক্তির কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে সর্ব্বস্ব ক্ষুইয়ে বসে আছে, কেননা মনুষ্যত্ব তার অপহৃত, প্রাণ শক্তি তার নিস্তেজ নিষ্পিষ্ট।

—আপনি বল্‌তে চান ধর্ম্মের কোন দরকার নেই ?

—দরকার আছে, সে ঐ dogmatic (যুক্তিহীন) ধর্ম্মের না। দরকার আছে বিবেকের, প্রাণের, মনুষ্যত্বের ধর্ম্মের। যে ধর্ম্ম মানুষকে নিত্য নূতন কর্ত্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত করে, একমাত্র ন্যায় ও সত্য ছাড়া অন্যের আধিপত্য স্বীকারে সম্মত হ'তে দেয় না, যে ধর্ম্ম মানুষকে বসিয়ে রাখে না, নিত্য নূতন আদর্শের অভিমুখেও সন্ধানে ছুটায়, দরকার আছে সেই ধর্ম্মের।

—কিন্তু ইসলাম যে dogmatic (যুক্তিহীন), বিবেকের, প্রাণের মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম না, তা আপনাকে কে বল্লে ?

—ফল দেখেই বৃক্ষের বিচার।

—আমার কিন্তু মনে হয় আকবর সাহেব আপনি ধর্ম্মকে ভুল বুঝেছেন। ধর্ম্মের অপব্যবহারকেই ধর্ম্ম মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের যেমন অপব্যবহার আছে আবার সৎব্যবহারও আছে, ধর্ম্মেরও তেমনি সৎব্যবহারও আছে যা হয়ত আপনার চোখে পড়েনি। ধর্ম্মের সৎব্যবহারটা যেদিন আপনায় চোখে পড়বে সেদিন ধর্ম্মের উপর আপনার আর কোন বিদ্বেষ থাক্‌বে না। আমার বিশ্বাস সে শুভদিন একদিন আপনার জীবনে আস্‌বে। আজ আসুন

আপনার "ধর্ম্মের গুণ্ডামী" পড়ে আমি যে উত্তর লিখেছিলাম তারই খানিকটা পড়ে শুনাই। বলিয়াই জমিদার সাহেব পকেট হইতে নোট বই বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

—মানুষকে মানুষ না বলে মুসলমান বলার অর্থ এই যে ন্যায় ও সত্যে অর্থাৎ খোদার উপর ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস নেই এমন যে মানুষ সেও নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয়, সেই ন্যায় ও সত্যে বিশ্বাসহীন মানুষ থেকে বিচারের জন্য বিশ্বাসী মানুষকে এক কথায় মুসলমান বলে। দুর্ভিক্ষে বা জল প্লাবনে বিপন্ন নরনারীকে উদ্ধারের জন্য প্রাণের প্রেরণায় নিজের সুখ সুবিধা তুচ্ছ করে যে মানুষ ছুটে যায় লোক সমাজে হিন্দুনামে অভিহিত হলেও সেই মুসলমান; আর যে মুসলমান নিজের প্রতিবেশীকে বিপন্ন দেখেও নিজের আরাম নিয়ে ঘরের কোনে বসে থাকে লোক সমাজে মুসলমান বলে অভিহিত হলেও বস্তুতঃ সেই অমানুষ বা কাফের। ইসলামে যে জাকাত ও খয়রাতের ব্যবস্থা আছে সে এই কথারই নির্দ্দেশ করে। সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পশুত্বের মোহে আচ্ছন্ন ছিল তখন ইসলামই মনুষ্যত্বের ধ্বজা উচ্চে তুলে ধরেছিল। আজ সেই ইসলামের শিক্ষা, দীক্ষা ও সৌন্দর্য্যে অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে জগতের অন্যজাতি যারা সেকালে কাফের বা অমানুষ নামে অভিহিত হ'ত। আর সেকালে যারা মুসলমান ছিল তাদেরই বংশধরেরা অনেকে আজ ইসলামের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজদিগকে মুসলমান ব'লে পরিচয় দিলেও বস্তুতঃ তারাই অমানুষ বা কাফের। যে প্রকৃত মানুষ মহম্মদকে (দঃ) মুখে না মানলেও অন্তরে সে মহম্মদের শিষ্য। কেননা একমাত্র মহম্মদই (দঃ) প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ প্রদর্শক।

মনুষ্যত্বের দুইটা দিক—আত্মরক্ষা ও পরসেবা; নিছক প্রেম আত্মরক্ষার অভাবে মাঠে মারা যায়। ইসার ধর্ম্ম suffering ও submission (দুঃখ ভোগ ও বশ্যতা স্বীকার) একগালে চড় দিলে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও। এতে ক'রে অন্যায় আরও আস্পর্দ্ধা পেয়ে যায় না? আত্মরক্ষা না করতে জান্‌লে পরসেবা করবে কি দিয়ে?

বুদ্ধের ধর্ম্ম—Renunciation বা বৈরাগ্য; সব ছেড়ে ছুড়ে বনে যাও, সংসার শ্মশান হ'ক। মানুষ এ মতও গ্রহণ করতে পারে না।

একাধারে আত্মরক্ষা ও পরসেবাই ইসলামের আদর্শ। ইসলাম কর্ম্মজগত থেকে মানুষকে ছিনিয়ে এনে মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির ধর্ম্মকে অস্বীকার করেনি। মহম্মদকে মুখে না মান্‌লেও মহম্মদের শিক্ষাও আদর্শকে যে মানে সে মুসলমান ছাড়া আর কিছু না। ইহা অন্তর্জগতের কথা। লৌকিক বা আচারের জগতে অনেক কিছু ইহার বিপরীত হলেও সে জন্য ইসলাম দায়ী হ'লেও দোষী না। ঐশ্বর্য্যশালী ধনীর ছেলে নিজের মূঢ়তায় পথের ভিখারী হলে তার ঐশ্বর্য্যকে সেজন্য দায়ী করা গেলেও যেতে পারে। কেননা ঐশ্বর্য্যই'ত তাকে অমন অলস, কর্ম্ম বিমুখও উশৃঙ্খল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের ধর্ম্মই হ'ল ঐ।

ইসলাম—মনুষ্যত্ব, ইসলাম মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য্য; ইসলাম কেবল লোকাচারের বাহ্যিক আড়ম্বর না। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে যে হীন, মনুষ্যত্বের গৌরবে যে দীন, সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও বস্তুতঃ সেই অমানুষ বা কাফের।

কোরাণ, খোদা, রসুল দোজখ, বেহেস্ত না মানলে সে মুসলমান নয় —খুবই সত্যি কথা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ঐ কথাগুলো মানা। ও গুলোর অর্থ বিশ্লেষণ করে ওর মর্ম্ম উপলব্ধি হ'লে কোন প্রকৃত

মানুষের ও মান্‌তে আপত্তি থাক্‌তে পারে না। কোরাণ ইসলামের গ্রন্থ বা ইসলাম প্রদর্শক, ইসলাম নয়। ইসলামের আরম্ভ হ'লেও শেষ নয়। ইসলামের একটুখানি হলেও সমগ্র নয়। ইসলাম অসীম অনন্ত বিশ্বাত্মার ধর্ম্ম। কোটি বৎসর কেটে যাবে ইসলামের আবিষ্কার শেষ হবে না। খোদা ইসলামের লক্ষ্য—সেই অসীম অনন্ত অপরিজ্ঞের রহস্য।রসুল সেই অসীমেরই বার্ত্তাবহ বা পথ নির্দ্দেশ। কিন্তু পথের শেষ কোথায় সে সম্বন্ধে রসুলও অজ্ঞ। দোজখ বেহেস্ত শুধু মরার পরে নয়, মরার পরে এবং আগেও ; দোজখ বেহেস্ত হাতে হাতে। প্রত্যেক কাজ, কথা বা চিন্তার পরবর্ত্তী ফলই দোজখ অথবা বেহেস্ত। ভাল কাজের ভাল ফল, মন্দ কাজের মন্দ ফল। বিজ্ঞানও বলে কোন কাজ কথা বা চিন্তা একে বারে নষ্ট হয় না। প্রত্যেক কাজ কথা বা চিন্তার একটা না একটা ফল আছেই, মন্দ কাজের মন্দ ফল, ভাল কাজের ভাল ফল। ইহাই দোজখ অথবা বেহেস্ত। মন্দ কাজ কথা ও চিন্তায় চরিত্র ও মন কতখানি হীন হয়ে পড়ে স্থুল দৃষ্টির মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না ; তাই ঐ প্রকার রূপকের অবতারণা বা Symbolization of the spiritual fact.

ইসলামে যে পুনর্জীবনের উল্লেখ আছে সে কি ঐ প্রাণহীন মৃত দেহটারই উত্থান? বিজ্ঞানও বলে, কোন কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না। mather ও spirit (বস্তু ও আত্মা) কি মরে? না, তার transformatin বা রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের নামই পুনর্জীবন বা পুনরুত্থান (Resurrection of the dead) আমার এই রূপটা যাবে, আমি যাব না। আমি বেঁচে থাকব রূপান্তরে আমার পুত্র কন্যা, ও কলত্রাদিদের ভিতর—আমার কথা কাজ ও চিন্তায়,

অনন্তকাল যা পৃথিবীর আত্মা ও রূপকে mould ও influence (গঠন ও পরিবর্ত্তন) করবে। বিজ্ঞানও বলে, সন্তান পিতা মাতা ও পূর্ব্ব পুরুষের Physical ও mental traits inherit করে (দৈনিক ও মানসিক আকৃতি লাভ করে)

শুধু সন্তান সন্ততিতে নয়, সমাজেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিষ্ফল হয় না। মহম্মদের (দঃ) শিক্ষা দীক্ষার ফল আজও সমাজ ভোগ করছে ; কোন অতীত যুগে কে একজন মদ খাওয়া আবিষ্কার করেছিল সেটা আজও চলে এসে কোটি জীবনকে affect (প্রভাবান্বিত) করছে। ইহাই ইসলামের পাপ ও পুণ্য—দোজখ ও বেহেস্ত। আকবর গভীর শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুনিতেছিল। এই পর্য্যন্ত বলা শেষ হইলে সে বিস্ময়ের সহিত কহিল—ইসলাম সত্যিই এই ?

—হ্যাঁ, এসলাম এই, ইহার কম একটুও না। ইসলাম মানে, শান্তি। স্বভাবের নিয়ম পালনেই শান্তি ; ক্ষুধা স্বভাবের নিয়ম ; খেলেই শান্তি, না খেলেই অশান্তি। জেলে মানুষ খেতে পায় তবু শান্তি পায় না। তার কারণ খাওয়া ছাড়া স্বভাবের আরও অনেক দাবী আছে। স্বভাবের দাবী অনেক, কোন একটা উপেক্ষা করে কোন একটার উপর বেশী চাড় দিলেই অশান্তি। যে মানুষ শুধু খায়, কোন কাজ কর্ম্ম অথবা ব্যয়াম করে না, অজীর্ণ এসে শীঘ্র তার শরীরে অশান্তি ঘটাবে। জ্ঞান অন্বেষণ ও স্বভাবের একটা স্পৃহা, স্বভাবের রহস্য অসীম অনন্ত, জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহাও তেমনি মানুষের অসীম অনন্ত। দেখুন ত বিজ্ঞানের সঙ্গে কেমন মিল ; কোরাণে অনেক কথা আছে যা হয়ত বিজ্ঞান অনুমোদন করে না

কিন্তু কাব্য করে। শুধু বুদ্ধি বিচার বা বিবেকই মানুষের সব না; বিবেক ছাড়াও একটা জিনিষ আছে সেটা মানুষের instinct feeling বা ভাব। গোটা মানুষটাকে দেখ, কেমন সুন্দর দেখাবে; বিজ্ঞান কিন্তু analyse ও anatomize (বিচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ) করে দেখাবে ও কিছু না, বরং বিভৎস ও ঘৃণ্য। কিন্তু তাই বলে মানুষ মানুষকে কি কম ভাল বাসে? বিজ্ঞানের চোখে কাব্য কিছু না. তাই বলে কি কাব্য মানুষের জন্য সত্যই কিছু না? কোরাণ একাধারে কাব্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সমষ্টি। কোরাণকে Appre Ciate (বুঝতে) করতে হলে কোন জায়গায় কবির দৃষ্টি, কোন স্থানে দর্শনের দৃষ্টি থাকা চাই।

আকবর কহিল—ন্যায় ও সত্যে যার বিশ্বাস আছে সে তবে মুসলমান?

—নিশ্চয়।

—ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে যদি কোরাণের কোন বিশেষ অনুজ্ঞা বা বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের দরকার হয় আপনি তা সহ্য করবেন?

—ধর্ম্মের স্পিরিট বজায় রেখে খোলসটা দরকার হলে বদ্‌লাতে পারেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে জান্‌তে চাই ধর্ম্মের কোন্ অনুজ্ঞাটা আপনার কাছে অসঙ্গত ঠেকে।

—এই ধরুন শিল্প ও সঙ্গীত, কোরাণের মতে হারাম; কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য জগতের মতে শিল্প ও সঙ্গীতকে বাদ দিলে জীবনের অনেকটা মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়।

—শিল্প ও সঙ্গীত সে যুগে যে stage (অবস্থা) এ ছিল সেটা নিতান্তই অশ্লিল. তাই তখন সেটা হারাম হয়েছিল, এখন এটা চল্‌তে পারে, মোট

কথা উদ্দেশ্য ধরেই বিচার করতে হবে। উদ্দেশ্য ঠিক সৎ ও মঙ্গল হলে ইসলামের সঙ্গে আপনার কোন বিরোধ নেই।

—মুসলমান ভিন্ন অন্ন কোন জাতীয় লোক যারা সৎ ও মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়ে চলে কিন্তু "লা ইলাহা ইল্লাহ মহম্মদ ইয়া রসুলোল্লা" কলেমা পড়েনি বা মহম্মদকে শেষ পয়গম্বর বলেও মানে না তারা তা'হলে মুসলমান ?

—নিশ্চয়! আমি পূর্ব্বেই বলেছি মহম্মদকে মুখে না মান্লেও অন্তরে তারা মহম্মদের শিষ্য! তারা মহম্মদের শিক্ষাকে মানে। মহম্মদের উদ্দেশ্য আর তাদের উদ্দেশ্য এক। মোটের উপর কথা এই সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করলেই সে মুসলমান, তার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে আপনার কোন বাধা নেই।

—এ কথা হয়ত আর কেউ স্বীকার করবে না।

—না করুক, তবু ইহাই ইসলামের শিক্ষা। আজকের দিনে ইসলামের এই শিক্ষাকেই জোর গলায় দুনিয়ার সমক্ষে প্রচার কর্তে হবে। তা'হলেই দেখ্বেন ইসলামের নামে যত কুসংস্কার, যত অপবাদ নিমেষে দূর হয়ে গিয়ে এক বিশ্বজনীন উদার ও মহতি মূর্ত্তিতে ইসলামের যথার্থ রূপ প্রকটিত হবে। ইসলাম সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ধর্ম্ম না, ইসলাম উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। শুদ্ধ ও পবিত্র অন্তঃকরণে যেই আসুক সবারই ইহার সুবিশাল ক্রোড়ে স্থান আছে।

—নামাজ, রোজা, কলেমা প্রভৃতি তবে কিছু না ?

—ধর্ম্মের দুইটা দিক—ভিতর ও বাহির, ধর্ম্মের ভিতরটা হ'ল তার উদ্দেশ্য। চর্চ্চার অভাবে সব জিনিসেই মরচে ধরে। চর্চ্চার অভাবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ না হয় সেজন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধি

বিধান, অনুষ্ঠান কলেমা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে—যেমন নামাজ রোজা, প্রভৃতি ; ইহাই ধর্ম্মের বাহিরের দিক, means to the end (উদ্দেশ্য সাধনের উপায়)। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যেখানে ঠিক আছে উপায় সেখানে একটা আসবেই, তাই এ গুলোর জন্য তত বেশী পরোয়া না করলেও চল্‌তে পারে।

এম, এল, সি সাহেবের কথাগুলো আকবরের খুব ভাল লাগিলেও তাহার সন্দেহ দূর করিতে পারিল না। তাহার বোধ হইতে লাগিল—ও যেন ধর্ম্মের একটা অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা (forced interpretation)। এম, এল, সি সাহেব আকবরের মনোভাব বুঝিলেন কিন্তু হতাশ হইলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, আকবর যখন সত্য অনুসন্ধিৎসু ধর্ম্মের সত্য একদিন আপনি আসিয়া তাহার নিকট ধরা দিবে।

এমন সময় তাহারা বাড়ী পৌঁছিলে এম, এল, সি সাহেব মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলেন, আকবর বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

আজ ক' বৎসর অনাবৃষ্টিতে ভাল ফসল না হওয়ায় ও বর্ত্তমান বৎসর পাটের দাম নামিয়া ২৲ দাড়ানোয় দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। প্রজাবৃন্দ অন্নকষ্টে হাহাকার করিতেছে। আজ সকালে উঠিয়া এম, এল, সি সাহেব একাকী বৈঠক ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য। অদূরে পড়িবার ঘরে আকবর তাহার ছাত্র ছাত্রীদের লইয়া পড়াইতেছে। দেওয়ানজী আসিয়া জমিদার সাহেবকে একটা সেলাম দিয়া বলিতে লাগিলেন— দেশের যে অবস্থা খাজনা আদায় অসম্ভব। কি করা যায় ?

—কি রকম অবস্থা বলুন ত ?

—অধিকাংশ লোকই দুই একদিন না খেয়ে আছে।

—চাউলের দাম কি ?

—চাউলের দাম খুব বেশী নয়, তবে টাকার অভাব, কাজ নেই।

—তবে এক কাজ করুন, খাজনা আদায় এ বৎসর থাক। ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তার কতকটা আমি তুলে দিচ্ছি, রিলিফ ওয়ার্কে (Relief work) ব্যয় করুন। রিলিফ ওয়ার্ক মানে, টাকা বিতরণ না। লোককে বাজার দামে খাটিয়ে নিয়ে টাকা দিন। আমার জমিদারীর ভিতর যে সকল গ্রামে জলকষ্ট আছে সে সকল গ্রামে এক একটী পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করুন ; যেখানে রাস্তা ঘাটের অসুবিধা রাস্তা ঘাট তৈয়ারীর ব্যবস্থা করুন। যে সকল গ্রামে স্কুল আছে অথচ ঘর নেই সেখানে স্কুল ঘর তৈয়ারী করাইতে পারেন। মোট কথা

কাজের অভাবে, অর্থের দায়ে কেউ যেন কষ্ট না পায়। কর্ম্মপ্রার্থী স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করবেন।

দেওয়ানজী সেলাম্ দিয়া প্রস্থান করিলে জমিদার সাহেব আকবরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—মাষ্টার সাহেব, আপনারা যতদিন স্বাধীনতা পেয়ে দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না করতে পারছেন ততদিন দেশের জন্য আপনাদের কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা; ধরুন এই দুর্ভিক্ষ্যের সময় ?

—কর্ত্তব্য অনেক আছে, কিন্তু সামর্থ্য ও সম্বল নেই।

—যদি আমি সম্বল কিছু দিই।

—নিশ্চয় খাট্‌তে পারব।

—তবে আসুন আপনি কেবল তদন্ত করবেন লোকে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেয় কি না।

—আমি কিন্তু আপনার মত মানুষের সংস্বভাব সম্বন্ধে অতটা বিশ্বাসী না। মানুষ বসে খেতে পারলে কাজ করবে এ বিশ্বাস আমার নেই। এই সেদিনও কতকগুলি লোককে অগ্রিম টাকা দিলাম কাজ করে দেবে বলে; তারা টাকা নিয়ে গেছে, আর আসেনি। কাজে যদি নামেন আপনিও হয়ত এ কথার সত্যতা বেশ বুঝতে পারবেন। আকবর কোন প্রত্যুত্তর করিল না।

এম, এল, সি কহিলেন—আগামী বৃহস্পতিবার সদরে youth conference (যুবা সম্মিলনী) বস্‌ছে, যাবেন না'কি ?

—যেতে ত পারলে হয়!

—চলুন আমিও যাব। আমার একবার কলকাতায় যাওয়ার দরকার। কনফারেন্স শেষে আমি ব্যাঙ্ক থেকে রিলিফ ওয়ার্কের

জন্য কিছু টাকা তুলে দেব, আপনি নিয়ে আস্‌বেন। আমিও ঐ পথে কলকাতায় যাব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কনফারেন্স শেষে এম, এল সি সাহেব কলিকাতায় রওনা হইলেন, টাকা লইয়া আকবর বাড়ী ফিরিল। মোটরে আসিতে সহসা পথে মোটর বিকল হইয়া গেল। মেরামত চলিতে লাগিল। মেরামত শেষে মোটর ঠিক হইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মোটর হইতে যে স্থানে সে অবতরণ করিল সেখান হইতে এম, এল, সি'র বাড়ী প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে। তাহাকে লইবার জন্য গরুর গাড়ী আসিবার কথা ছিল; তাহার পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় হয়ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। রাত তখন প্রায় ১০টা। আকবর ভাবিতে লাগিল এখন সে কি করিবে। অন্ধকার রাত্রে টাকা লইয়া একাকী পথ চলাও ত বিপজ্জনক; বিশেষতঃ এই দুর্ভিক্ষের সময়, চারিদিকে যখন চুরি ডাকাতি হইতেছে খুবই। এই সেদিনও এই পথেই জনৈক পথিক দস্যুর কবলে প্রাণ হারাইয়াছে। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে রাতটা কোন রকমে কাটাইতে পারিলেও সে কাল প্রত্যুষে উঠিয়া হাটিয়া যাইতে পারিবে কিন্তু আজকাল কাহারাও বাড়ীতে অতিথি হওয়া ও ত নিরাপদ নয়। তবে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে তাহাই ঠিক করিল। গ্রামে ঢুকিয়া দেখিল, গ্রামবাসীরা অত্যন্ত হীন অবস্থার লোক। কয়েক জনের বাড়ি গিয়া দেখিল, বৈঠক ঘর নাই; শেষে এক বৈঠক ঘরওয়ালা বাড়ী মিলিল। বৈঠক ঘরে কেউ উপস্থিত ছিল না।

সে চিৎকার করিয়া ডাকিল কেউ বাড়ী আছে কিনা; শেষে কে একজন বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি চায়। আকবর

নিজের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলে বালকটী বাড়ীর ভিতর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া জানাইল সেখানে জায়গা হইবে না। সে অন্য অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু কেহই রাজী হইল না। সহসা সে শুনিতে পাইল কে যেন আজানে দিতেছে। আজান ধ্বনী লক্ষ্য করিয়া যাইয়া দেখিল—এক মসজিদ। প্রাণে তবু একটু আশা সঞ্চার হইল। আজান দিতেছিলেন যিনি তিনি তখন নামাজে খাড়া হইয়াছেন। আকবরের নামাজ জানা থাকিলেও পড়ার অভ্যাস ছিল না; তবু সে ওজু করিয়া মাথায় চাদর জড়াইয়া নামাজে উদ্যত হইল। নামাজ শেষে পূর্ব্বোক্ত লোকটী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে নিজের যথা-যথ পরিচয় দিল। লোকটীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল—নিরক্ষর হইলেও তিনি ভদ্রলোক। লোকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

—আশ্রয় নিয়েছেন কোথায়?

—আপাততঃ এই মসজিদেই

—খাওয়া পিয়া?

—রাত্রে না খেলেও চল্‌বে।

আপনি বিদেশী ভদ্রলোক, উপোষ থেকে যাবেন এই গ্রাম থেকে, সেই কি হয়? চলুন আমার বাড়ীতেই, নুন ভাত যা দু'টো জুটে খাবেন।

আকবর প্রথমতঃ আপত্তি করিলেও শেষে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

আহারাদি শেষ করিয়া তাহার বৈঠক ঘরেই রাত্রি যাপনের স্থান পাইল। লোকটীও তাহার পার্শ্বেই নিজের জন্য অন্য একটী বিছানা পাতিয়া লইলেন। অনেক কথা বার্ত্তার পর লোকটী যখন ঘুমাইয়া

পড়িলেন আকবর ভাবিতে লাগিল—কেতাবী ধর্ম্মের উপর সে আজ অনেক কাল হইতেই খড়্গ হস্ত; নামাজ রোজা মৌলভী মসজিদ তাহার চক্ষুশূল। আজ এই দুঃসময়ে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে কে? সে কি ঐ কেতাবী ধর্ম্ম না? মসজিদ যদি না থাকিত, নামাজের জন্য আজান যদি না হইত তবু সে হয়ত অনেক কষ্টে কোন একজনের বাড়ীতে কোন ক্রমে একটু আশ্রয় পাইলেও পাইতে পারিত কিন্তু এই দূর বিদেশে শিক্ষাহীন ধর্ম্ম কর্ম্মহীন সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে এমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত কি সে? এই যে অজ্ঞ, নিরক্ষর লোকটার ভদ্রতা ও মনুষ্যত্বের স্পর্শে সে আজ প্রীত মুগ্ধ বিমোহিত সে কি ঐ ধর্ম্মেরই দান না? নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, অপরিচিত অনাত্মীয় ব্যক্তিকে খাতির করিতে ওকে কে শিখিয়েছে? সংসারের তাড়নায়, পার্থিবতার মোহে হয়ত সময়ে ওকে অনেক মিথ্যা কথা বলিতে হয়, প্রতিদন্দী প্রতিবেশীর সঙ্গে সংগ্রামও করিতে হয়, হয়ত অনেক কিছু অন্যায়ও করিতে হয়, তবু সময়ে এমন একটু মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেও ও কুণ্ঠিত নয়। মনুষ্যত্বের এই সাড়া ও পেলে কোথায়? এই স্বজনহীন অপরিচিত দূর বিদেশে, এমন একটা গণ্ডগ্রামে এমন একটা দুঃসময়ে অমন একটা মস্‌জিদ অমন একটা আজান ধ্বনি বাস্তবিকই কি প্রাণে আশার আলো আনিয়া দেয় না? আর ঐ মস্‌জিদ, ঐ আজান, ঐ নামাজ এমন একটু মনুষ্যত্ব বোধ এখানে কে এনে দিলে? সে কি ঐ মোল্লা মৌলভী না? মুহূর্ত্তে মোল্লা মৌলভীর উপর কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নত হইয়া আসিল। সে বুঝিল সহস্র দোষ ত্রুটি সত্বেও মোল্লা মৌলভী মানুষকে যা দিয়াছে তাহার মত মোল্লা বিদ্বেষী শিক্ষিতেরা তাহার

শতাংশের এক অংশও দিতে পারে নাই। পারিবেও কিনা সন্দেহ। যে সকল ধর্ম্মাদেশ সে আগে বিষচক্ষে দেখিত তাহার প্রত্যেকটার এক একটা সদর্থ ও সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে লাগিল। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অমানিশা ঘোর কাটিয়া গিয়া দিব্য বিশ্বাসের আলোকে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। সে বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল, কেমন যেন একটু সুখ, কেমন একটু তৃপ্তি, কেমন একপ্রকার বিমল নির্ভরতার ভাব যাহা হইতে সে অনেককাল বঞ্চিত ছিল। তাহার মনে পড়িল এম, এল, সি সাহেবের সেই বাণী, যাহা সে তখন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই এখন তাহা নিবিড় সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল—স্বর্গ হইতে যেন কোন ফেরেস্তা আসিয়া একাকী বনের মাঝে ঘোর অন্ধকারে পথ হারানো তাকে দিব্য আলোক বর্ত্তিকায় পথ দেখাইতেছে। পুলকের আতিশয্যে সে শেষে কাঁদিয়া ফেলিল। সম্মোহিতের মত আবেগের উত্তেজনায় তাহার বলিতে ইচ্ছা হইল—'এম, এল, সি সাহেব, আমাকে এখন কি করতে হবে'? ইচ্ছা হইল যদি এই মুহূর্ত্তে এম. এল, সি সাহেবকে কাছে পাইত তবে নিশ্চয় তাহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নূতন করিয়া ধর্ম্ম দীক্ষা লইত। সহস্র দিনের চেষ্টায় সহস্র দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া সে যাহা না পাইয়াছে আজ এই মুহূর্ত্তে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে সে তাহা পাইয়া গেল। বাস্তবিকই সে আজ ধন্য হইল।

———o———

সকালে ছাত্র ছাত্রীরা বসিয়া পড়িতেছে, আকবর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাবিতেছে—সাধারণ গরীবের ছেলে আর ইহাদের চেহারায় একটা পার্থক্য আছে। কেমন একটা মাধুর্য্য, কেমন এক প্রকার সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার ভাবে ইহারা সজ্জিত ও উদ্দীপ্ত যাহাতে ইহাদের দেখিতেও একটা তৃপ্তি ও আনন্দ আছে। আর জগতে যাহা সুন্দর, মহান ও তৃপ্তিকর তাহা সাধারণের উপভোগ্য ও আদর্শ স্থানীয় কি না ? তাহা যদি হয় সে উপভোগ ও আদর্শ যাহা দ্বারা সম্ভব হইয়াছে তাহা বাঁচাইয়া রাখা সমাজের কর্ত্তব্য কি না ? জগতে রাজা বাদসা প্রভৃতি যদি না হইত তাজমহল, মতি মসজিদ, পিরামিড প্রভৃতি যাহা যুগে যুগে অসংখ্য মানুষের সৌন্দর্য্য পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে তাহা হয়ত সম্ভব হইত না। দেশে যদি রাজা মহাজন না থাকিত দেশের অসংখ্য লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রতিপালিত করিত কে ? তবে ? আকবরের সহসা মনে হইল হয়ত ধনবৈষম্যেরও একটা সার্থকতা আছে। জগতে কোন কিছুই একেবারে নিরর্থক নয়। এমন সময় পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল। অতিশয় কৌতূহলের সহিত চিঠি খানি খুলিয়া পড়িয়া লইয়া সে হঠাৎ দমিয়া গেল। দারুণ বিষাদে তাহার মুখের ভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিয়া ছাত্র ছাত্রীরা স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তাহার চোখ দিয়া কয়েক বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সাজেদা চুপ থাকিতে না পারিয়া কহিল—মাষ্টার সাহেব, চিঠিতে কি খবর ?

—খবর ? আমার স্ত্রীটী মারা গেছে।

—মারা গেছে !

—হ্যা।

—কেন, কি হয়েছিল ?

—তা কিছু লেখেনি, তবে সে এক অসুখে ভুগছিল হয়ত তাতেই—

শুনিয়া সকলেই সমবেদনার বিষাদে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

—আপনি এখন বাড়ী যাবেন তা'হলে ?

—বাড়ী ত যেতে হবে, কিন্তু তোমার আব্বা (পিতা) কল্‌কাতায় খরচ্‌পত্রের দরকার।

—আচ্ছা আমি মাকে বলছিগে, যাব ?

—যাবে, অত তাড়া তাড়ি কি, পড়া শেষ করেই যাবে। বলিয়া একান্ত উদাসীনের মত ভাবাকুল মৌনী হইয়া রহিল

খানিক পরে কি ভাবিয়া সে নিজেই কহিল—আচ্ছা যাও, আজ তোমাদের ছুটী।

ছুটী পাইয়া অন্যদিনকার মত তাহারা আহ্লাদে ছুটা ছুটি করিল না, ধীর শান্ত ভাবে প্রস্থান করিল।

তাহাদিগকে বিদায় দিয়া আকবর ভাবিতে লাগিল—হয়ত উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে যখন আগে একদিন তাহার অসুখের কথা শুনিয়াছিল, কেন সে তাহার যথা সর্ব্বস্ব দিয়া চিকিৎসা করায় নাই ? তাহার এই মৃত্যুর কারণ প্রকারান্তরে হয়ত সেই। সে আজ প্রথম উপলব্ধি করিল—দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব সে সম্পূর্ণ পালন করে নাই। একটা জীবন ভার স্কন্ধে লইয়া সে তাহার দিকে কোন দিন না চাহিয়া অন্য চিন্তায় অন্য

খেয়ালে কাটাইয়াছে, সেটা কি তাহার কম বড় অপরাধ? সে যেন কোন নেশায় মত্ত হইয়া ছিল, বাস্তব জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য তাহার কাছে ধরা পড়ে নাই, আজ তাহা দিব্য মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া অনুশোচনার বহ্নিরূপে তীক্ষ্ণ শেলের মত আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—সে এক ভুল করিয়াছে, এক নিদারুণ ভুল করিয়াছে যাবার জন্য জীবন ব্যাপী অনুতাপ আছে কিন্তু প্রতিকার নাই। খবর পাইয়া জমিদার পত্নী সাজেদাকে দিয়া আকবরের বিপদে সহানুভূতি জানাইয়া কয়েকখানি নোটে ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে ইচ্ছা করিলে মাষ্টার সাহেব কিছু দিনের জন্য বাড়ী হইতে ঘুরিয়া আসিতে পারেন।

যথা সময়ে আকবর রওনা হইল। পথে বাহির হইয়া তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—যে দিন সে এই পথ দিয়া আসিয়াছিল সেদিনও তাহার জাহানারা বাঁচিয়াছিল। হায়! সে যদি তখন জানিতে পারিত।

না, এ যেন ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর চক্রান্ত। মানুষকে অকারণ ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যেই তাহার এই নিদারুণ অভিনয়।

যথা সময়ে আকবর বাড়ী পৌঁছিয়া জাহানারার মৃত্যুর ইতিপূর্ব্ব সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া বুঝিল—সে যাহা অনুমান করিয়াছিল তাই। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবেই সে মারা গিয়াছে। তাহার শোকসাগর আরও অবুঝ উদ্বেল হইয়া উঠিল। জাহানারার পরিত্যক্ত শিশু সন্তানটীকে তাহার ক্রোড়ে আনিয়া দেওয়া হইল। সে তাহাতেও সান্ত্বনা পাইল না। একটা অসংস্করণীয় মারাত্মক ক্ষতির বোধ ঝঞ্ঝার মত দুর্নিবার বিক্রমে তাহার প্রাণের উপর দিয়া বহিয়া

যাইতে লাগিল। সে নিরুপায় বোধ-শক্তিহীন অসাড় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুদিন শ্বশুরালয়ে সেইভাবে কাটাইয়া সে শেষে বাড়ী রওনা হইল। পথে যাইতে তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—সে শুধু দুঃখ সয়ে ব্যথা নিয়ে গেছে। এই বিচিত্র পৃথিবী, ঐ ফুল ফসল আলো হাওয়া সুশোভিত সুন্দর মাঠ কোন দিন তাহার কাছে উজ্জল আশার জ্যোতিতে অর্থপূর্ণ হইয়া দেখা দেয় নাই। তাহার সহিত বিবাহে যুক্ত হইয়া সে কেবলি জীবনব্যাপী নিরাশার কালমেঘ দেখিয়াছে, আশার উজ্জ্বল আলো একদিনও দেখিতে পায় নাই। হায়! এই পথ দিয়া তাহারা উভয়ে কতবার গিয়াছে আসিয়াছে, কতবার তাহারা এই বটবৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছে। উপরে ঐ অসীম নীল আকাশ, দূরে ঐ দিগ্বলয়ের কোলে ঘন কাল বন-রেখা, সম্মুখে ঐ সুদূর প্রসারিত ফুল ফসল সুশোভিত বিচিত্র সুন্দর মাঠ, গাছের ডালে ঐ পাখীদের কলরব, আজও সেই তেমনি আছে কিন্তু সে নাই। উঃ কি অসহনীয় এই বিয়োগ! কি দুঃসহ এই ব্যথা।

কিছুকাল বাড়ীতে অবস্থান করার পর কলিকাতার প্রকাশকের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকার মণি অর্ডার ও "ধর্ম্মের গুণ্ডামী" সমুদয় বিক্রী হইয়া যাওয়ায় পুনরায় ছাপাইবার অনুমতি চাহিয়া একখানা চিঠি আসিল। চিঠি ও টাকা পাইয়া কিন্তু আকবর খুব খুসী ও উৎফুল্ল হইতে পারিল না। আজ ত তাহার টাকার কোন দরকার নাই। তাহার জাহানারা গিয়াছে সেই সঙ্গে তাহার সব গিয়াছে, দেশের কাজ করিবার মত বুকের জোর ও উৎসাহ

আর কৈ ? তবে আবার সে টাকা লইয়া কি করিবে ? আকবরের বোধ হইল, টাকা না, এ যেন নিয়তির এক নির্ম্মম পরিহাস।

কিছুকাল পরে এম, এল, সি সাহেবের চিঠি আসিল, লিখিয়াছেন :

—বাড়ী আসিয়া আপনার স্ত্রী বিয়োগের শোচনীয় সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। আপনার এ ক্ষতির কোন প্রতিকার ও সান্ত্বনা নাই। আপনার শোকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানিবেন।

বহুদিন পরে পুনরায় চিঠি আসিল আজ অনেকদিন হইতে আপনার কোন খোঁজ খবর নাই। কেমন আছেন ? স্ত্রী-হারা হইয়া কি সব ভুলিয়া গেলেন ? আপনার জীবন-সঙ্কল্প ও সাধনা ? স্বজন-বিয়োগ সকলেরই আছে কিন্তু তাই বলিয়া লক্ষ্য হারা হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা কি পুরুষের কাজ ? আপনি যে ব্রত নিয়াছেন তাহাতে ত আপনার এমনটী মানায় না। আপনার স্ত্রী গিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীই চলিয়া যায় নাই। এখনও লক্ষ লক্ষ জীবন আছে যাহাদের জন্য আপনি বাঁচিয়া থাকিতে ও কাজ করিতে পারেন।

সাজেদার বিয়ের ভার আপনারই উপর। আমরা আপনার আসার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

পত্র পাইয়া কাল বিলম্ব না করিয়া আকবর রওনা হইল। পথে বাহির হইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ তাহার অর্থের অভাব নাই ; কিন্তু হায় ! যদি তাহার জাহানারা থাকিত তবে সে তাহাকে লইয়া কত সুখ ও আনন্দ পাইতে পারিত। পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ যা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের আকাঙ্খা ও চেষ্টার পর আবিষ্কৃত সম্ভব হইয়াছে আজ তাহা সব তাহার

ভোগের জন্য উন্মুক্ত; কিন্তু সে কৈ, যাহার সুখে সে সুখী হইতে পারিত, যে আগে ভোগ করিলে তাহার ভোগ সম্ভব হইত?

ষ্টেশনে টিকেট করিয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে, আমজাদ দাঁড়াইয়া আছে। আমজাদ কিন্তু তাহাকে তখনও দেখে নাই। বহুদিনের পুরাতন বন্ধুকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াই আকবরের প্রাণটা আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া গিয়া আলাপ করে। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করিয়া থামিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব দিক মুখ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে কাহার ডাক শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল—আমজাদ, তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছে—কি হে কোথায় থাক, এতকাল যে দেখা নেই, একটু খোঁজ খবরও নাও না, সব ভুলে গেলে?

আকবর প্রত্যুত্তরে কহিল—এখন কি করছ?

এর আগে আমার কথা কখন মনে করেছ কি?

—করেছি, কিন্তু ক'রে কি করব, আমারই কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না।

—এখন হয়েছে?

—হ্যাঁ, এক রকম।

—কেমন?

—কেমন না বেশ, আমার সেই স্ত্রীটী মারা গেছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত, ভারমুক্ত, নির্ভয়, বেপরোয়া, সেই আগেকার মত। বলিয়াই বিবর্ণ মুখে হাসিয়া ফেলিল। আমজাদ দেখিল সে হাসিতে আনন্দ নেই, কিন্তু দুঃখ আছে, বড় করুণ ব্যথা-সূচক!

—ছেলে পুলে কিছু হয় নি?

—একটা আছে।

—কত বড়?

—বছর দুই বয়স।

—বেশ, আর একটা বিয়ে কর, তাকে ত পাল্‌তে হবে!

—বিয়ের কথা আর ব'ল না, বিয়েতে যে কি মজা তা আমি বেশ বুঝেছি। ছেলের সৃষ্টি কর্ত্তা ছেলেকে পাল্‌তে পারে পারুক, না পারে, আমি নাচার।

—আমারই তবে একটা জোগাড় করে দাও।

—কি করছ, আগে বল?

—কি করছি তা পরে হবে। মেয়ে টেয়ে কিছু আছে সন্ধানে? তোমার জন্যেই এতদিন অমার বিয়ে করা হয় নি।

আকবর মনে করিল, বুঝি ঠাট্টা, তা সে ঠাট্টারই পাত্র বটে। আত্ম-সম্মানে আহত তেমনি ম্লান দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিল।

আমজাদ কহিল—মনে করছ আমি ঠাট্টা করছি? তোমার গা ছুয়ে বল্‌ছি, সত্যিই। সেই যে গোলমালে তোমাকে বিদায় দিলাম সেই থেকে কেবলই একটা পরিতাপ আমার বুকের ভিতর বিঁধছে। আজ আমি বি, সি, এস প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হয়ে মহকুমার ভার পেয়েছি, তবু আমার প্রাণে আনন্দ নেই। কোন্ ছোট বেলাকার বন্ধু তুমি। বহুদিনের একত্র বাসের ভিতর দিয়ে কত বড় একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধনে প্রাণটাকে তোমার সঙ্গে গেঁথে ফেলেছিলাম আমিও আগে তা বুঝিনি, কিন্তু যে দিন থেকে তোমার সঙ্গে ছাড়া ছাড়ি হ'ল সেই দিন থেকে তোমার অভাব আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি

করছি। এত সৌভাগ্যের ভিতরও আমার সুখ নেই। তোমার বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি লিখে কত প্রকারে তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি, প্রাণটা হাহাকার ক'রে উঠেছে। আজ আমি তোমাকে পেয়ে সত্যিই বলছি জীবন ফিরে পেয়েছি, বিশ্বাস করছ না? আমজাদ তাহার অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার আশায় কাতর কাঁদ কাঁদ দৃষ্টে আকবরের দিকে চাহিল। আকবর বন্ধুর সত্যিকার মনোভাব উপলব্ধি করিয়া অন্তরে অন্তয়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়া হাকিম হওয়ার সংবাদে খুসী হইয়া কহিল—'হাকিম হয়েছ' শুনে সুখী হ'লাম; কিন্তু আমার প্রস্তাবমত বিয়ে করবে তুমি?

—কেন করব না? তুমি কি আমার অযোগ্য বন্ধু?

—পাত্রী দেখ্‌তে যেতে হয় তাহ'লে।

—এর মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল?

—হ্যা।

—কোথায়?

—ঐ ট্রেণ এসে পড়েছে, ট্রেণে উঠে বল্‌ব।

ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিয়া আকবর এম, এল, সি সাহেব ও তাঁহার কন্যা সাজেদার কথা পাড়িল। আমজাদ সকল বিষয় শুনিয়া আপত্তি করিল না। হাকিম হইয়া আমজাদ যে মহকুমার ভার পাইয়াছে সেটা ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমা। আমজাদ সেইখানেই ফিরিয়া যাইতেছে। ঠিক হইল কিছুদিন সেইখানে অবস্থান করিয়া আকবর এম, এল, সি সাহেবের বাড়ী যাইবে। ইতিমধ্যে এম, এল, সি সাহেবকে আমজাদ সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপার

বলিয়া সাজেদার সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবে; উত্তর আসিলে দুই বন্ধুতে একত্রে পাত্রী দেখিতে যাত্রা করিবে।

নিজেদের সম্পর্কে সমস্ত কথা ফুরাইয়া যাইবার পর আমজাদ কহিল—হ্যা হে, তুমি যে একদিন তোমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের কোন এক মেয়েকে তার স্বামী কোন মৌলভীর প্ররোচনায় তালাক দিয়েছিল বলেছিলে সে মৌলভীর বাড়ী কোথায়, বলতে পার ?

—কেন বলত ?

—দরকার আছে, ঠিক সেই রকম এক মেকদ্দমা আমি পেয়েছি।

—বলত কেমন ?

আমজাদ বলিতে লাগিল—লোকটার নাম কুদ্দুছ, স্ত্রীর নাম আমিনা। তাদের বাড়ী নদীয়া জেলার বাসন্তিপুর বলে কোন গ্রামে। আকবর সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—ও ঠিক! ঠিক! ঐ বটে. বলত ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে. শুনেছিলাম মৌলভী আমিনাকে নিকে ক'রে নিয়ে গেছে। তার পর ?

—তারপর তাদের একটা ছেলে হয়েছে। এদিকে কুদ্দুছ তার স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার আশায় সুযোগ বুঝে একদিন (ওরসের দিনে) মৌলভীর বাড়ী গিয়ে তার সাথে দেখা করে; মৌলভী টের পেয়ে তাকে ধরে এনে বেদম প্রহার করে। প্রহারে অপমানিত হয়ে সে এক নালিশ রুজু করেছে, তার স্ত্রীকে মৌলভী ছলনা পূর্ব্বক কৌশলে তালাক দিইয়ে নিয়ে জোর পূর্ব্বক নিকে করেছে ও তাকে অন্যায় করে মারপিট করেছে, এই অভিযোগে।

আকবর কহিল—মোকদ্দমার দিন কবে ?

—এই আস্‌ছে সোমবার।

—কি বিচার করবে মনে করেছ ?

—আমেনাকে হাজির করতে বলা হয়েছে, তার জবানবন্দি শুনে যা হয় হবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে আদালত বসিল। বলা বাহুল্য আদালত গৃহে আমজাদের পার্শ্বেই আকবর স্থান গ্রহণ করিল।

যথা সময়ে আমিনাকে বোরখা মণ্ডিতা অবস্থায় কাটগড়ায় আনা হইলে হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন।

—আপনার কি বক্তব্য আছে, বলুন।

প্রত্যুত্তরে আমেনা কুদ্দুছের সহিত তাহার বিবাহ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আদ্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে খুলিয়া বলিল।

হাকিম কহিলেন—আপনার কি মনে হয়, মৌলভী ছলনা পূর্ব্বক কৌশলে আপনাকে আপনার স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়ে নিকে করেছে ?

—আমি জানিনা ছলনা কাকে বলে, শুধু এইটুকু জানি যে এ সবই আমার ভাগ্য দোষেই হয়েছে।

—মৌলভীর কোন দোষ নাই ?

—না

কুদ্দুছ কিন্তু বলে মৌলভীর প্ররোচনা ব্যতীত সে তালাক দিত না। সে ইচ্ছে করে তালাক দেয় নাই, মৌলভীর কথা মতই দিয়াছে।

—মৌলভী যদি আপনাকে আপনার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে, দেবেন ?

সভা শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল, হাকিম ও হাসিলেন।

—এখন আপনার মতামত কি ?

— মতামত এই যে, আমি যেমন আছি তেমনই থাক্‌ব।

—কুদ্দুছের নিকট ফিরে যেতে চান না ?

—না

—কেন ?

—অসম্ভব বলে '

—কেন, মৌলভী যদি স্বেচ্ছায় আপনাকে তালাক দেয়, তার সঙ্গে ত পুনরায় বিয়ে হ'তে পারে '

—আমি তা চাইনে।

—কেন ?

—তার প্রতি আমার ভালবাসা আছে, কিন্তু সেজন্য তার কাছে ফিরে যেতে চাইলে আমার বর্ত্তমান শিশু সন্তানটার প্রতি অবিচার করা হবে। আমি ত তার মা !

—কেন, সেটাকে তার বাপের কাছে রেখে যেতে পারেন, অথবা নিয়েও যেতে পারেন

—রেখে যদি যাই আমার মাতৃত্ব সান্ত্বনা পাবে না, নিয়ে যদি যাই, তার পিতার পিতৃত্বকে অবমাননা করা হবে, সেই সঙ্গে তার প্রতি অবিচার করা হবে। ওঁর (কুদ্দুছ) প্রতি অন্যায় করলে হয়ত উনি তা সয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু তার প্রতি অন্যায় করলে নিতান্ত অন্যায় হবে, যেহেতু সে নাবালক ও আমি তার মা '

কুদ্দুছ ও শুনিতেছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমিনা কিছুতেই মৌলভীকে সমর্থন করিবে না ' আমিনার সম্মুখেই সে দাঁড়াইয়াছিল। আমেনা তাহার মুখের হতাশ বিষন্ন ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে

অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিল; কিন্তু উপায় নাই, সে যে মা! নাবালক সন্তানের ভবিষ্যত সে কেমন করিয়া মাড়াইয়া চলিবে? কুদ্দুছের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে সে আর ক্রন্দন রোধ করিতে পারিতেছিল না। তাই সে জবানবন্দি শেষ করিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে কাঠগড়ার বাহির হইয়া গেল।

মৌলভীর বিরুদ্ধে ২নং অভিযোগ, কুদ্দুছকে মার পিট করা। ১নং শেষ করিয়া ২নং আরম্ভ করিতে যাইতে কুদ্দুছ দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল। হুজুর! মৌলভীর বিরুদ্ধে আমার আর কোন অভিযোগ নেই। সে আমাকে যে মার পিট করেছিল তা ঠিকই করেছিল, যেহেতু আমি তার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আমিনা মৌলভীকে নিকা করিলেও সে আমারই কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ভুল; তার উপর আমার কোন দাবী দাওয়া নেই। একদিন সে আমারই ছিল, আজ সে অপরের। এ আমার কপাল! মাপ করবেন, আমি মিছে মিছে আপনাকে হয়রাণ করলাম। আমি চল্লাম। বলিয়াই একটা সেলাম দিয়া সে দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল। বলা বাহুল্য আকবরের সঙ্গে তার প্রথমেই পরিচয় হইয়াছিল কিন্তু বিদায় কালে তার কথা একেবারে ভুলিয়া গেল।

যথা সময়ে জমিদার সাহেবের নিকট হইতে উত্তর আসিল —আপনি সাজেদার বিয়ের সম্বন্ধ করিয়া যে চিঠি দিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। পাত্র কোন উচ্চ শিক্ষিত গভর্ণমেণ্ট অফিসার ও আপনারই সহপাঠী বন্ধু জানিয়া আরও সুখী হইলাম। বন্ধু সমভি-ব্যাহারে বেড়াইতে আসিতে চাহিয়াছেন, আমার তাতে আপত্তি

নাই, যে কোন তারিখে আপনাদের সুবিধা মত আসিতে পারেন। আমি প্রস্তুত আছি।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহারা উভয়ে যাত্রা করিল। যথা সময়ে এম, এল, সি, সাহেবের বাড়ী পৌঁছিলে তিনি বিশেষ সমাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন ও পরিতোষ সহকারে আহারাদি শেষ করিয়া বৈকালে ভিতর ও বহির্বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাঙ্গনে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য এম, এল, সি সাহেবের সরল ও ভদ্র আলাপে আমজাদ বিলক্ষণ প্রীত হইল।

সন্ধ্যায় সাজেদা, সালেহা ও সোলেমান যখন তাহাদের পড়িবার ঘরে বসিয়া পড়িতেছে আকবর আমজাদকে লইয়া গিয়া হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। সাজেদা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত পাত্র স্বয়ং আসিয়াছেন। তাই সে তাহাদিগকে দেখিয়াই পলায়ন করিতে যাইতেছিল। আকবর বাধা দিয়া কহিল—যেওনা, সাজেদা। সাজেদা থমকিয়া দাঁড়াইল। আকবর আমজাদকে দেখাইয়া কহিল—ইনি আমার এক বন্ধু, তোমাদের বাড়ীতে এসেছেন বেড়াতে। এঁকে একটা গান শুনাও ত!

সাজেদা লজ্জা করিতেছিল। অনেক পীড়া পীড়িতে শেষে রাজী হইল। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে" গাহিতে লাগিল। আমজাদের সম্মুখেই হারমোনিয়ম যোগে গাহিতেছিল। সাজেদার কোমল কণ্ঠের সুরের স্পর্শ ও তাহার সুন্দর চেহারার লালিমা-রাগ-রঞ্জিত মধুর সৌন্দর্য্য আমজাদকে শীঘ্রই কোন স্বপ্নময় অমৃতলোকে পৌঁছাইয়া দিল। সে তন্ময় চিত্তে মুগ্ধ আবেশে শুনিতেছিল; সাজেদা যে তাহার ভবিষ্যত সহধর্ম্মিণী

হইবে, সে কথা তাহার মনেই ছিল না। গান শেষ হইলে সে সহসা ভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—সাজেদা লজ্জায় ঘামিয়া উঠিয়াছে। তাহার সহসা মনে পড়িল, তাহার সম্মুখে বসিয়া থাকিতে সাজেদার হয়ত খুবই কষ্ট হইতেছে। তাই তাহাকে সে অবস্থা হইতে রেহাই দেওয়ার ছলে সালেহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—কই, তোমার একটা শুনি। সালেহা আমজাদের দিকেই চাহিয়াছিল, এইবার লজ্জায় হাসিয়া মুখ ফিরাইল। আকবর কহিল—আচ্ছা তুমি ঐ গানটা কর—কে বিদেশী মন উদাসী ইত্যাদি। সালেহা ইচ্ছুকই ছিল, তাই সে তেমন বেশী আপত্তি করিল না। কণ্ঠের স্বর ও মুখের চেহারায় সাজেদা ও সালেহায় একটা বিশেষ সাদৃশ ছিল। আমজাদ তাহা লক্ষ্য করিল। কিন্তু স্বরের গভীরতায় ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে তাহারা ছিল একেবারে দুই। বয়সের গুণে, যৌবন উন্মেষে একটীতে যাহা অল্প পরিস্ফুট, অপরটীতে তাহা একেবারে মৌন। তাই সালেহার গান আমজাদের খুব ভাল লাগিলেও তাহাকে তেমন মাতাল করিল না। গান শেষ হইলে আমজাদ সোলেমানের দিকে চাহিয়া কহিল—কই, তোমার একটা শুনি। সোলেমান অসঙ্কোচ অকুণ্ঠায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আকবর কহিল—তুমি একটা কবিতা বল—বল বীর! চির উন্নত মম শির।

সোলেমান তাহাই আবৃত্তি করিল। আবৃত্তি শেষে আমজাদ তাহাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যেককে ১০৲ টাকার একখানি নোট হাতে দিয়া বিদায় দিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য কথা বার্ত্তায় কাটাইল। আমজাদ অপেক্ষা করিতেছিল, আকবর কোন

সময় তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিবে। আকবর ইচ্ছা করিয়াই চুপ ছিল, মতামত জিজ্ঞাসা করিলে পাছে বন্ধুত্বের খাতিরে আমজাদ মিথ্যা কথা বলে। শেষে আমজাদই কথার ফাঁকে একবার বলিয়া ফেলিল, বিয়ের তারিখটা কবে ঠিক করছ? আকবর কহিল—তোমার ইচ্ছামতই তারিখ ঠিক হ'ক। পছন্দ হয়েছে ত!

আরে পছন্দ! মুসলমানের ঘরে এমন মেয়ে থাকতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। আকবর আমজাদের কথার অনুমোদনে কহিল—মেয়ের বাপকে আমার আরও ভাল লাগে। অমন শান্ত উদার ধীর, অমন সমাহিত বিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক তেজঃপূর্ণ চেহারা, অমন মমতাপরায়ণ উন্নত হৃদয়ের ভদ্রলোক এ পর্য্যন্ত আমার চোখে একটাও পড়ে নাই।

পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া মানুষ সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে না; এখন দেখিতেছি তাহা ভুল। এম, এল, সি সাহেবের সংস্পর্শে এসে আমার এতদিনকার নাস্তিকতার বড়াই চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাস্তবিক বল্‌ছি, আমি নব জীবন পেয়েছি। আগে আমার ধারণা ছিল, ধর্ম্মটা ভুল, এখন দেখছি একমাত্র ধর্ম্মই সত্য। ধর্ম্মই মানুষকে মানুষ করতে পারে, আর কিছুতে নয়। অবশ্য এ ধর্ম্মমতের একটু বিশেষত্ব আছে। এম, এল, সি সাহেবের মতে 'উদ্দেশ্য' ধরেই মানুষের ধর্ম্ম বিচার করতে হবে। সৎ উদ্দেশ্যে যে পবিত্র জীবন যাপন করে সেই মুসলমান, আর যে ব্যক্তি অসৎ ও অপবিত্র জীবন যাপন করে লোক সমাজে মুসলমান নামে অভিহিত হয়েও সে অমুসলমান, অমানুষ বা কাফের। এ হিসাবে বাছাই করলে হয়ত অনেক 'হঁয় নয়' হয়ে যাবে কিন্তু সে জন্য ইসলামকে দোষ দেওয়া যায় না। ইসলাম মনুষ্যত্বই,

সত্য এবং পবিত্রতাই তার আদর্শ। অবশ্য কোনটা সত্য কোনটা অসত্য, ভাল না মন্দ, পবিত্র বা অপবিত্র তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে এবং মানুষ যতদিন তার বুদ্ধির সম্পূর্ণতায় না পৌছাচ্ছে ততদিন এ মতভেদ থাকবেও। ইসলাম যে এই মতভেদ স্বীকার করে নিয়েছে তার প্রমাণ তার ধর্ম্ম-সাধনার বিভিন্ন স্তরের নির্দ্দেশ-শরীয়ৎ, হকিয়ৎ, তরিকৎ ও মারফৎ। মানুষের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ ইসলামের জাহেরী ও বাতেনী (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) এলেমের উল্লেখই তার প্রমান। এর থেকেই বুঝা যায় ইসলাম তার অনুসারীদের পরমত-অসহিষ্ণু হ'তে বলেনি ও নিজের বর্ত্তমান মতটারও যে কখন কোন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে না, তাও কিছু বলেনি। অবশ্য ইমানের উপর সে খুব জোর দিয়েছে, কিন্তু সে তার উদ্দেশ্যের প্রতি যে ইমান তারই; উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্বন্ধে যে কখন কোন নড়-চড় হবে না, তা কিছু বলেনি।

মুসলমানের ধর্ম্মান্ধতা তার বহুদিনের ঐশ্বর্য্য ভোগের পরিণাম; যা নিয়ে সে একদিন জ্ঞান শক্তি ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল তার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজনীয়তা সে একেবারে ধারণাই করতে পারেনি। আজ তার সে অবস্থা আর নাই কিন্তু তার সে মনোবৃত্তি এখনও আছে। কিন্তু এটা ক্ষণিক; কালের স্রোতে পারিপার্শ্বিক জগতের সংঘাতে আবার তার ঘুম টুটবে। সে আবার চোখ মেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটবে, জ্ঞানের সন্ধানে দিগ্বিদিকে। হিন্দুর বেদ, খৃষ্টানের বাইবেল, মানুষের অর্জ্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান, বিশ্ব-প্রকৃতি, নিজের অন্তরের অসীম রহস্য প্রভৃতি কিছুই তার অস্পৃশ্য ও উপেক্ষার বস্তু থাকবে না। সে সকলের ভিতর খুঁজবে তার

আত্মার অপরিমেয় খোরাক, অসীম পরিতৃপ্তি। অপরের ভুল দেখিয়ে সে যেমন তাকে স্বমতে আন্‌বার চেষ্টা করবে. নিজের ভুল সংশোধনের পথ ও সে চিরদিন বন্ধ করে রাখ্‌বে না। এইরূপেই সে অপরের সাথে হাত ধরা-ধরি করে জ্ঞানের আলোকে পথ চল্‌বে তার চিরারাধ্য দেবতা সকল সম্পূর্ণতার আধার খোদাতালার পানে। হয়ত এমন একদিন আস্‌বে যেদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদ্দেশ্যের ধারণায় সকলের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে অন্য সকলের ন্যায় তারও কোন বিশেষ নামে নিজের পরিচয় না দিয়ে কেবল মানুষ নামে পরিচয় দিলেই চল্‌বে। তার ধর্ম্মের নাম হয়ত তখন ইসলাম না হয়ে হবে মনুষ্যত্ব। কিন্তু সে একই কথা; মুসলমানও মানুষ, ইসলাম ও মনুষ্যত্ব একই জিনিষ। কেবল শব্দের হের ফের। আমজাদ মৃদু হাসিয়া কহিল—যা'হক ধর্ম্মের উপর তোমার যে আর সে উগ্র বিদ্বেষ নেই ও বিপ্লবের পথ ছেড়ে ক্রমোন্নতির পথে এসেছ ইহাই যথেষ্ট। বর্ত্তমানে তোমার রাজনৈতিক মতামতটা কি শুনি।

আকবর উত্তরে খানিক কি ভাবিয়া লইয়া কহিল—এর পূর্ব্বে আমার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, লোকটি বেশ উচ্চ শিক্ষিত। তিনি সেদিন যা বল্লেন আমি এখন অনেক দিক দিয়ে ভেবে দেখেছি তা ঠিক। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে গভর্ণমেণ্ট আছে এর আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব ও নয়, বাঞ্ছনীয় ও নয়।

—বাঞ্ছনীয় নয় কেন?

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আগে চাই বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য সুশিক্ষিত সৈন্য দল। যদি ধরেই নেওয়া যায় সেরূপ সৈন্যদল গড়ে তোলা সম্ভব; কিন্তু সেটা হিন্দু প্রধান হবে কি মুসলমান প্রধান হবে তা নিয়ে হিন্দু মহা-সভা আর মোসলেম-

লিগে বাধবে ঝগড়া। ফলে একটা Civil war বা অন্তর্বিপ্লব ঘটাও বিচিত্র নয় এবং সেই সুযোগে আফগান এসে এ দেশ দখল করে নেবে না তা কে বল্‌তে পারে? আর আফগান যদি এ দেশ দখল করে আজ না হয় আফগানের সিংহাসনে নাদির, কাল যে বাচ্চাই সাকো অথবা তেমন কেউ এসে জুটবে না তাই বা কে বল্‌তে পারে? ইংরেজের শাসন তবু ভাল কিন্তু বাচ্চাই সাকো একেবারে অসহ্য।

—কেন, সেখানে ত বুদ্ধির জোর নেই, আছে কেবল গায়ের জোর, যা বেশ তুমি পছন্দ কর।

করি সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি একটু মনুষ্যত্বও না থাকে তবে চলে কি করে? ইংরেজের আর যা হক মনুষ্যত্ব যে একেবারে নেই একথা বলা যায় না। তা না হ'লে আজ যেমন হিটলার কমুনিষ্টদের ধ'রে ধ'রে বলি দিচ্ছে বা তৈমুর বা নাদির যেমন দিল্লীর রাজপথ মানুষের রক্তে প্লাবিত করেছিল ইংরেজের রাজপথে গান্ধীর জয় চিৎকারীদের হয়ত তেমন দশাই হ'ত। ইংরেজের মনুষ্যত্বের আরও অনেক নিদর্শন আছে। তার মনুষ্যত্ব না থাক্‌লে গঙ্গা সাগরে সন্তান নিক্ষেপ, সহমরণ প্রভৃতি বর্ব্বর প্রথা হয়ত আজও চল্‌ত। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তক, বাল্য বিবাহ নিরোধক প্রভৃতি জন-হিতকর আইন পাশ হ'ত না। মণ্টেগু চেমস ফোর্ড বিকর্ম্ম, হোয়াইট পেপার প্রস্তাব, কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব আমাদের ভাগ্যে জুট্‌ত না।

ইংরেজ যে আমাদের রাজা এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। ইংরেজের পূর্ব্বে দেশ যে অবস্থায় ছিল সেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় বলেই বিধাতা ইংরেজকে এ দেশে পাঠিয়েছিলেন আশীর্ব্বাদ রূপে।

ইংরেজের অধীনে আমরা মানুষ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি এবং পাব। বিক্রমশালী সিংহকে দেখে শৃগাল যতই ফেউ! ফেউ! করুক সিংহ কিন্তু তার বিক্রম শৃগালকে কিছুতেই ধার দিতে পারে না। বড় জোর দিতে পারে একটু আশ্রয়! আমরাও তেম্‌নি ইংরেজের আশ্রয়ে বর্গীরূপ মারাঠা দস্যু, ঠগ, আরাকাণি মগ, রাজশক্তির পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হেতু নানারূপ শাসন-বিশৃঙ্খলা ও আমাদের নিজেদেরই বহুবিধ সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার অত্যাচার ও উপদ্রব থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচে আছি। 'তা বই স্বাধীনতা ত দূরের কথা আমাদের অস্তিত্বই হয়ত দুনিয়া থেকে মুছে যেত। আর বাদসাহ আরঙ্গজেবের সময় হলে আমাকে ত সর্ব্ব প্রথম বহুপূর্ব্বেই কোরবাণী দিত।

আমাদের আসল শত্রু আমাদেরই অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অযোগ্যতা। এই কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর হবে, বিপ্লবের পথে নয়, ধীরে ধীরে শিক্ষার ভিতর দিয়ে; শিক্ষার যে গলদ সেটা তার অসম পরিবেশনের ফল। শিক্ষার সার্ব্বজনীন বিস্তারে এ গলদ দূর হবে। আমরা যেদিন সকলেই এই শিক্ষার দ্বারা উন্নত হয়ে প্রকৃত মানুষ হতে পারব সেদিন যেহেতু ইংরেজও মানুষ সে আপনি এসে আমাদিগকে দাসরূপে নয়, বন্ধুরূপে আলিঙ্গন দেবে। সেদিন ইংরেজ ও আমরা এক হব। আমাদের অধীনতার বেদনাও আর থাক্‌বে না।

—তা হলে পথে এসেছ, বল?

আকবর মৃদু হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, তাই বটে।

— আমজাদ খানিক অন্য মনে কি ভাবিয়া লইয়া কহিল।

এম, এল, সি সাহেবকে আমারও খুব ভাল লাগে। তিনি সত্যিই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে যদি তিনি রাজী হন তবে তারিখটা তিনিই ঠিক করে দেবেন। বিয়েটা যত শিগ্‌গির হ'লে ভাল হত তবে কথা কি আমি বর্ত্তমানে একেবারে কপর্দ্দকশূন্য।

আকবর কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়ের চোখে আমজাদের দিকে চাহিয়া কহিল, তা মনে ক'র না তুমি পণ নিতে পারবে। পণ নেওয়া ধর্ম্মে নিষিদ্ধ তা জান?

—জানি, তবে পাওয়া গেলে ছাড়ে কে?

—পাওয়া যাবে? এম, এল, সি সাহেব তোমাকে পণ দেবেন মেয়েও দেবেন? তার মেয়ে কি অযোগ্যা পাত্রী?

—হাজার যোগ্যা হ'লেও মেয়ে পুরুষের ঘাড়ে বোঝা ছাড়া কি?

—বোঝা হয় ব'ও না, কে তোমায় বাধ্য করছে বিয়ে কর?

—বিয়ে না করে উপায় কি? তুমি না হয় একবার সখ মিটিয়ে নিয়েছ।

—সখ মেটাবে পণও নেবে, সে কেমন?

আমজাদ হাসিয়া কহিল—আরে না, পাগল হয়েছ, আমি কি অর্থের কাঙ্গাল? তবে আমার হাতে এখন কিছু নেই, কিছু জম্‌তে দাও, খরচ পত্র ত করতে হবে!

—হ্যা, তাই বল।

—তাই বলছি ছাড়া আর কিছু বলিনি, পণ নিলে যে পাত্রী-পক্ষকে হীন করা হয় তা কি আমার জানা নেই?

—আমারও ঠিক ঐ কথা, যার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে যাচ্ছ

সে তোমার যোগ্যই, তার সঙ্গে আবার দর কষাকষি কেন? অর্থের সম্পর্ক এনে মানুষের প্রাণের সম্বন্ধটাকে হীন করতে আছে?

—তোমার সুবিধামতই তবে দিন ঠিক হ'ক, আমার যতদূর বিশ্বাস তিনি কোন কিছুতেই আপত্তি করবেন না।

—তবে অন্ততঃ ছ'মাস আমায় সময় দাও।

—বেশ তাই।

—আমি ত কালই চ'লে যাচ্ছি, তুমি এখন থাকবে এখানে?

—দেখি এম, এল, সি সাহেব কি বলেন, তিনি ছুটী না দিলে আমি আর যাচ্ছি কোথায়!

এমন সময় হটাৎ এম, এল, সি সাহেব আসিয়া পড়িয়া কহিলেন—মাষ্টার সাহেব, ওরা আজ পড়তে আসেনি?

—হ্যা এসেছিল, ছুটি দেওয়া হয়েছে।

—মাষ্টার সাহেব, সাজেদার বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত কিন্তু আপনার ছুটী নেই। আমার ইচ্ছে আছে বিয়ে শেষ করে আপনাকে নিয়ে একবার দেশ ভ্রমণে যাব। সাহিত্য চর্চ্চাই যখন আপনার জীবনের ব্রত তখন তার Materials (উপাদান) ত চাই! দেশ ভ্রমণে অনেক কিছু পাবেন সে দিক দিয়ে। তা' ছাড়া স্ত্রী-বিয়োগের ব্যথাটাও অনেকটা ভুলে যেতে পারবেন। আমারও দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে পৃথিবীটা একবার ভাল ক'রে দেখে নেওয়ার সখ আমার অনেক দিন থেকেই রয়েছে, তাই এই সংকল্প—সম্মত আছেন এতে?

—আকবর স্মিত মুখে কহিল—দেশ ভ্রমণে সম্মত না হওয়ার কোন কারণই নেই। আমার ওতে খুবই আগ্রহ।

—বেশ, তবে বিয়ের পূর্ব্বের সময়টা আপনি এখানে থেকেই সাহিত্য চর্চ্চা করুন ও ছেলে মেয়েদের একটু ক'রে পড়ান। দরকার হ'লে ইচ্ছে মত বাড়ী যাবেন, হ্যা ?

—আচ্ছা।

(২৬)

এক বৎসর পরের কথা। এম, এল, সি সাহেবের কন্যা সাজেদার সঙ্গেই আমজাদের বিবাহ ঠিক হইয়াছে। বর-সমভিব্যাহারে আকবর ও অন্য কতিপয় বন্ধু স্বজন বরহামরাহ সাজিয়া বিবাহ বাড়ীতে যাত্রা করিয়াছে। বারাসাত ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ট্রেন বেলা ১০ টায়। বেলা ৯টায় বসিরহাট হইতে যে ট্রেন আসিল তাহা হইতে অনেক যাত্রী নামিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ কুদ্দুছকে দেখিতে পাইয়া আকবর কৌতূহল বশতঃ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া নিকটে বসাইয়া কি উদ্দেশে কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিল।

—কুদ্দুছ মৃদু হাসিয়া কহিল—সে অনেক কথা।

—বলুন না শুনি !

—মোকদ্দমার কথা জানেন বোধ হয়।

—হ্যা, জানি।

—গিয়েছিলাম সেই মৌলভীর বাড়ীতে।

—কেন ?

—সে অনেক কথা ।

—বলুন না শুনি ?

—জানেন ত আমেনার জবানবন্দি শুনে আমি চলে এলাম। তার কিছুকাল পরে একখানা চিঠি পেলাম। আমেনারই লেখা। 'এই দেখুন সেই চিঠি' বলিয়া পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া আকবরের হাতে দিল। আকবর পড়িতে লাগিল—

সে দিন জবানবন্দি শুনে হয়ত খুবই দুঃখিত হয়েছেন ও আমার উপরে আপনার একটা ঘৃণা এসেছে এবং আমি যে কত নিরুপায় তা হয়তো আপনি বুঝেন নি ।

আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন তবে আমি এইটুকু বল্‌তে পারি যে আপনার উপরে আমার ভালবাসা অটুটই আছে। তালাক দিলেও আমার বিশ্বাস ছিল আপনি একদিন আপনার ভুল বুঝ্‌তে পেরে অনুতপ্ত হবেন ।

আমার ধারণা মিথ্যে হয়নি। কিন্তু ভাগ্যচক্র আজ আমাকে এমন এক অবস্থায় এনে ফেলেছে যেখান থেকে আপনার নিকট ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। আমি এখন সন্তানের জননী। নাবালক সন্তানের ভবিষ্যত মাড়াইয়া চলিবার মত শক্তি আমার কৈ ? অতএব নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে প্রাণের দুর্নিবার আকাঙ্খা অস্বীকার করিয়াই আপনার সঙ্গে পুনর্মিলনে আমাকে অসম্মত হইতে হইতেছে। আপনি দুঃখিত হইলে হইতে পারেন অথবা আমাকে অন্য কিছু ভাবিলেও ভাবিতে পারেন কিন্তু আমি নিরুপায় !

মৌলভীকে ইচ্ছা করিয়াই আমি নিকা করি নাই, ভাগ্যচক্র ও আপনার নির্বুদ্ধিতার ফলেই এ কাজ হইয়াছে। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতাম তালাক দিয়াও আপনি আমাকে ভালবাসেন কিংবা যদি ভাইয়ের অবস্থা স্বচ্ছল হইত তাহা হইলেও হয়ত এ দারুণ লজ্জা ও বিড়ম্বনার ভিতর আমাকে আসিতে হইত না। কি করিব? ভাগ্যের হাত এড়ায় কার সাধ্য?

চিঠি শেষ করিয়াই আকবর কুদ্দুছকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু মৌলভীর বাড়ীতে গিয়েছিলেন কেন?

কুদ্দুছ বলিতে লাগিল—এ চিঠি পাওয়ার প্রায় ছয় মাস পরে এক ফকিরের মুখে সংবাদ পেলাম—মৌলভীর ভারি দুরবস্থা, সে ঠিক প্রকৃত মৌলভী না। কিছুকাল বিদেশ থেকে ঘুরে এসে নিজেকে দেওবন্দ মাদ্রাসার পাশ করা মৌলভী বলে প্রচার করে ও পীর সেজে লোককে মুরীদ করতে থাকে। লোকেও তাকে বিশ্বাস ক'রে দলে দলে মুরীদ হ'তে থাকে। কিন্তু ফাঁকি ত আর চিরদিন চলে না! আমার সঙ্গে মকদ্দমার কিছুকাল পরে এক জবরদস্ত আলেমের কাছে এক মিলাদ সভায় ওর বুজরুকি ধরা পড়ে; ফলে মুরীদান যারা ছিল তারা ওকে ছেড়ে পালায়। আগে ঐ করেই ওর সংসার চলত। এখন সে পথ বন্ধ হওয়ায় অচলের এক শেষ। দুরবস্থার কথা শুনে আমার ভারি ভাবনা হ'ল। মনে হল—হয়ত আমিনারও কত কষ্ট। হয়ত কোন দিন না খেয়েও উপোষ থাকতে হয়। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে সাহায্য করলে মৌলভী নিতে রাজী হবে কি না জিজ্ঞেস করে এক চিঠি লিখি। উত্তরে মৌলভী আমাকে তার বাড়ীতে

ডেকে পাঠায়। আমি অনেক ইতস্ততঃ করে শেষে ভাগ্যের উপর ভর করে তার বাড়ী যাই। মৌলভী আমাকে দেখে খুব খুসী হয় ও আদর আপ্যায়ন করতে থাকে। সে যে আমায় পরে খুব অন্যায় করেছে তা স্বীকার ক'রে মাপ চায়। অন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া শেরে আমেনাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দিয়ে চ'লে আসে। আমেনা আমারই অথচ সে মৌলভীর এ ভাব আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু ভেবে দেখলাম সে যা বলে তা ঠিকই। তাকে যদি আমি ফিরে নিই তার ছেলেটা বড় হয়ে কি ভাববে? আমাকে দেখে সে কাঁদতে লাগল। আমারও কান্না পাচ্ছিল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ক'টা টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম তাই তার হাতে দিয়ে চ'লে এলাম। আসার সময় মৌলভী ও আমাকে খুব ভদ্রভাবেই বিদায় দিলে।

আমজাদও শুনিতেছিল। শুনিয়া অনুভব করিতেছিল তার অন্তরটা। অজ্ঞ, মূঢ়, মূর্খ সে! তবু তার ভিতর ভালবাসা কত গভীর! দয়া, ক্ষমা, প্রভৃতি বৃত্তি কত সহজ ও স্বাভাবিক। এত বড় অন্যায় করেছে যে মৌলভী তাকেও সে ক্ষমা করতে পারে। অতখানি করে ভালবাসে সে যাকে, তাকে সে না পেয়েও সুখী। কি মধুর আত্মত্যাগ!

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; বিবাহ উপলক্ষ্যে আকবর এক প্রীতি উপহার ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছিল, বিবাহ শেষে আকবর তাহা বিবাহ মজলিসে পড়িয়া শুনাইল।

পড়া শেষ হইলে কেহ কেহ তাস পাশা লইয়া বসিল, কেহ কেহ গল্প করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা শয়ন করিতে গেল। আকবর

তাহার পড়াইবার ঘরে একাকী শয়ন করিতে যাইয়া সহসা জাহানারার স্মরণে একটা ভাব মনে উদিত হওয়ায় লিখিতে লাগিল—

(আমার) সকল কথা ও কাজে,
তোমার কথাটী এখনও আছে আমার বুকের মাঝে ;
সকল দেখাও শুনায়,
তোমার ব্যথাটী আজিও কেমন মূর্ত্ত হইয়া রাজে ;
আমার সকল কাজে।

ব্যাকুল নয়নে ঊর্দ্ধ আকাশে চাই,
দেখি, মৌন নিথর অসীম নীলিমা চেয়ে আছে শুধু হায় ;
চির অনন্ত অন্তরাল-রেখা টানি,
যেন, তোমারি সে মুখখানি,
ঘিরেছে আকাশ, ঘিরেছে সৌদিনী,
তুচ্ছ শতেক সাজে।

নিশীথ আঁধারে গোপনে শিশির ঝরে,
উথলে আমার ব্যথার অশ্রু তোমারে উদ্দেশ করে
তোমায় স্মরিয়া প্রিয়ে,
কাঁদি যে একেলা সঙ্গিনী-হারা,
ধুধু নির্জ্জন গৃহে ;
তোমার আমার পরিচয় যেথা—
সারাটী সকাল সাঁঝে,
ব্যথার আকারে করুণ হইয়া বাজে ;

মায়ার পরশে মুগ্ধ হইয়া কার,
হেথাকার কথা ভুলেছ কি একেবার ?
ভুলেছ কি এই কামনা ও দ্বেষ কলুষ পুরিত
কুৎসিত ধরণীরে ?
সেথা কি শুধুই সুন্দর প্রেম প্রীতির মলয়
বহিছে মধুর ধীরে ?
তা' যদি হয় বেশ,
আমার দু'খের নাহিক লেশ,
শুধু, ক্ষণেকের তরে নিমেষ দেখায়,
বলে যেয়ো একবার—
হেথাকার মত সেথায় তোমার কাঁদিতে হয় কি আর ?
তা'হলে এ মূঢ় পরাণ আর কিছুই চাহেনা যে !
তোমার কথাটী এখনও আছে আমার বুকের মাঝে।

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	১	শ্রষ্টা	স্রষ্টা
৩৩	১৫	উপর্ষ্যোপরি	উপর্য্যুপরি
৫৩	১০	চোর্যাবৃত্তি	চৌর্য্যবৃত্তি
৫৪	৮ ও ১২	নির্দ্দোশ	নির্দ্দোষ
৬০	১০	জিঙ্গেস	জিজ্ঞেস
৯৩	৯	পুরুষান্তার	পুরুষান্তর
১১৫	১০	Malacious	malicious
১১৮	৫	মৃত্ব্যাবস্থা	মৃতাবস্থা
১১৮	৬	উচ্ছৃঙ্খলা	উচ্ছৃঙ্খলতা
১২০	১২	হ'লে	হ'তে
১৫৫	১৮	সমভিব্যবহার	সমভিব্যাহার
১৫৭	১৫	আদ্যপ্রান্ত	আদ্যোপান্ত
১৬০	১	আনন্দে	আননে
১৬১	১৩	যোগ্য	ভোগ্য
১৬৬	৬	নির্দ্দেশ	নির্দ্দিষ্টা
১৬৬	১৯	Mather	Matter
১৬৯	১৬	মহতি	মহতী
২০১	৫	শেরে	শেষে
২০২	১২	সৌদিনী	মেদিনী
...	...	হা	তাঁ

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে অন্য কতিপয় ছোট খাট ভুল রহিয়া গেল। সম্ভব হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সারিয়া লইবার চেষ্টা করিব